Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্নিত নবীদের ঘটনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান নিহা

রোলঃ 227020442

১১ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনে বর্নিত নবীদের ঘটনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান নিহা

রোলঃ 227020442

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআনে বর্নিত নবীদের ঘটনা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত জাহান নিহা, আইডিঃ 227020442 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনে বর্নিত নবীদের ঘটনা" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নুসরাত জাহান নিহা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১১ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

নুসরাত জাহান নিহা

আইডিঃ 227020442

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (আলাইহিস সালাম)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)। মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন।[1]

অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন।[2] আর এ কারণেই স্ত্রী জাতি স্বভাবগত ভাবেই পুরুষ জাতির অনুগামী ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে একই নিয়মে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসাবেই যাত্রারম্ভ করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে। অতএব গুহামানব, বন্যমানব, আদিম মানব ইত্যাদি বলে অসভ্য যুগ থেকে সভ্য যুগে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে বলে কিছু কিছু ঐতিহাসিক যেসব কথা শুনিয়ে থাকেন, তা অলীক কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। সূচনা থেকে এযাবত এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানুষ কখনোই মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। মানুষ বানর বা উল্লুকের উদ্বর্তিত রূপ বলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) যে 'বিবর্তনবাদ' (Theory of Evolution) পেশ করেছেন, তা বর্তমানে একটি মৃত মতবাদ মাত্র এবং তা প্রায় সকল বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহর খেলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের অনুগত (লোকমান ৩১/২০) ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব (ইসরা ১৭/৭০)। আর সেকারণেই জিন-ফিরিশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলীস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় (বাক্বারাহ ২/৩৪)। অথচ সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতগুযার। সেকারণ জিন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে ফিরিশতাদের সঙ্গে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছিল ও তাদের নেতা হয়েছিল।[3] কিন্তু আদমের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। ফলে অহংকার বশে আদমকে সিজদা না করায় এবং

আল্লাহ ভীতি না থাকায় সে আল্লাহর গযবে পতিত হয়। এজন্য জনৈক আরবী কবি বলেন,

لوكان للعلم شرف من دون التقى

لكان أشرف خلق الله إبليسُ

‘যদি তাক্বওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত,

তবে ইবলীস আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ’ত’।

[1]. মুমিনূন ২৩/১২; ছাফফাত ৩৭/১১; রহমান ৫৫/১৪; তীন ৯৫/৪ ইত্যাদি।
[2]. নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮ ‘বিবাহ’ অধ্যায় ‘নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার’ অনুচ্ছেদ। আদম এর মূল উপাদান হ’ল মাটি, তাই তাকে ‘আদম’ বলা হয়। পক্ষান্তরে হাওয়ার মূল হ’লেন আদম, যিনি তখন জীবন্ত ব্যক্তি। তাই তাকে ‘হাওয়া’ বলা হয়, যা ‘হাই’ (জীবন্ত) থেকে উৎপন্ন (কুরতুবী), বাক্বারাহ ৩৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬২ পৃঃ।
[3]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৬৭।

শয়তানের সৃষ্টি ছিল মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ

ইবলীসকে আল্লাহ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার হায়াত দীর্ঘ করে দেন। মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য ও তাকে ধোঁকা দেওয়াই শয়তানের একমাত্র কাজ। ‘সে মানুষকে বলে কুফরী কর’। কিন্তু যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলে ‘আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্কে ভয় করি’ (হাশর ৫৯/১৬)। অন্যদিকে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে আল্লাহ মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন (বাক্বারাহ ২/২১৩)। আদম থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চবিবশ হাযার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন[4] এবং বর্তমানে সর্বশেষ এলাহীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মুসলিম ওলামায়ে কেরাম শেষনবীর ‘ওয়ারিছ’ হিসাবে[5] আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান

সমূহ বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন (মায়েদাহ ৫/৬৭)। পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংস তথা ক্বিয়ামতের অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়ম জারি থাকবে। শেষনবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর এমন কোন বস্তি ও ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবেন না।[6] এতদসত্ত্বেও অবশেষে পৃথিবীতে যখন 'আল্লাহ' বলার মত কোন লোক থাকবে না, অর্থাৎ প্রকৃত তাওহীদের অনুসারী কোন মুমিন বাকী থাকবে না, তখন আল্লাহর হুকুমে প্রলয় ঘনিয়ে আসবে এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।[7] মানুষের দেহগুলি সব মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যাবে। কিন্তু রূহগুলি স্ব স্ব ভাল বা মন্দ আমল অনুযায়ী 'ইল্লীন' অথবা 'সিজ্জীনে' অবস্থান করবে (মুত্বাফফেফীন ৮৩/৭, ১৮)। যা ক্বিয়ামতের পরপরই আল্লাহর হুকুমে স্ব স্ব দেহে পুনঃপ্রবেশ করবে (ফজর ৮৯/২৯) এবং চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের জন্য সকল মানুষ সশরীরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দরবারে নীত হবে (মুত্বাফফেফীন ৮৩/৪-৬)।

মানুষের ঠিকানা হ'ল তিনটি : ১- দারুদ দুনিয়া। অর্থাৎ যেখানে আমরা এখন বসবাস করছি ২- দারুল বরযখ। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কবরের জগত। ৩- দারুল ক্বারার। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন শেষ বিচার শেষে জান্নাত বা জাহান্নামের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

অতএব পৃথিবী হ'ল মানুষের জন্য সাময়িক পরীক্ষাগার মাত্র। জান্নাত থেকে নেমে আসা মানুষ এই পরীক্ষাস্থলে পরীক্ষা শেষে সুন্দর ফল লাভে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে, অথবা ব্যর্থকাম হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর সেখানেই হবে তাদের সর্বশেষ যাত্রাবিরতি এবং সেটাই হবে তাদের চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী ঠিকানা। আল্লাহ বলেন, 'মাটি থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি। ঐ মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব। অতঃপর ঐ মাটি থেকেই আমরা তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব' (ত্বোয়াহা ২০/৫৫)। অতঃপর বিচার শেষে কাফেরদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে এবং মুত্তাক্বীদের নেওয়া হবে জান্নাতে (যুমার ৩৯/৬৯-৭৩)। এভাবেই সেদিন যালেম তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে এবং মযলূম তার যথাযথ প্রতিদান পেয়ে ধন্য হবে। সেদিন কারু প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না (বাক্বারাহ ২/২৮১)।

আদম সৃষ্টির কাহিনী

আল্লাহ একদা ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে ‘খলীফা’ অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। বল, এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? তারা (সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে সৃষ্ট জিন জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে) বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে আবাদ করতে চান, যারা গিয়ে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার হুকুম পালনে এবং আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছি। এখানে ফেরেশতাদের উক্ত বক্তব্য আপত্তির জন্য ছিল না, বরং জানার জন্য ছিল। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না (বাক্বারাহ ২/৩০)। অর্থাৎ আল্লাহ চান এ পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টির আবাদ করতে, যারা হবে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহর বিধান সমূহের আনুগত্য করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। ফেরেশতাদের মত কেবল হুকুম তামিলকারী জাতি নয়।

খলীফা অর্থ

এখানে ‘খলীফা’ বা প্রতিনিধি বলে জিনদের পরবর্তী প্রতিনিধি হিসাবে বনু আদমকে বুঝানো হয়েছে, যারা পৃথিবীতে একে অপরের প্রতিনিধি হবে (ইবনু কাছীর)। অথবা এর দ্বারা আদম ও পরবর্তী ন্যায়নিষ্ঠ শাসকদের বুঝানো হয়েছে, যারা জনগণের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য ও ইনছাফপূর্ণ শাসক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে। কেননা ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও অন্যায় রক্তপাতকারী ব্যক্তিরা আল্লাহর প্রতিনিধি নয় (ইবনু জারীর)। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য, যা ফেরেশতাদের জবাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন প্রতিনিধি আপনি সৃষ্টি করবেন, যারা পূর্ববর্তী জিন জাতির মত পৃথিবীতে গিয়ে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে। বস্ত্ততঃ ‘জিন জাতির উপর ক্বিয়াস করেই তারা এরূপ কথা বলে থাকতে পারে’ (ইবনু কাছীর)।

অতঃপর আল্লাহ আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। ‘সবকিছুর নাম’ বলতে পৃথিবীর সূচনা থেকে লয় পর্যন্ত ছোট-বড় সকল সৃষ্টবস্ত্তর ইল্ম ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দিয়ে দেওয়া হ’ল।[7] যা দিয়ে সৃষ্টবস্ত্ত সমূহকে আদম ও বনু আদম নিজেদের অনুগত করতে পারে এবং তা থেকে ফায়েদা হাছিল করতে পারে। যদিও আল্লাহর অসীম জ্ঞানরাশির সাথে মানবজাতির সম্মিলিত জ্ঞানের তুলনা মহাসাগরের

অথৈ জলরাশির বুক থেকে পাখির ছোঁ মারা এক ফোঁটা পানির সমতুল্য মাত্র।[10] বলা চলে যে, আদমকে দেওয়া সেই যোগ্যতা ও জ্ঞান ভান্ডার যুগে যুগে তাঁর জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সন্তানদের মাধ্যমে বিতরিত হচ্ছে ও তার দ্বারা জগত সংসার উপকৃত হচ্ছে। আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দেওয়ার পর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন। কুরআনে কেবল ফেরেশতাদের কথা উল্লেখিত হ'লেও সেখানে জিনদের সদস্য ইবলীসও উপস্থিত ছিল (কাহফ ১৮/৫০)। অর্থাৎ আল্লাহ চেয়েছিলেন, জিন ও ফেরেশতা উভয় সম্প্রদায়ের উপরে আদম-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হৌক এবং বাস্তবে সেটাই হ'ল। তবে যেহেতু ফেরেশতাগণ জিনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, সেজন্য কেবল তাদের নাম নেওয়া হয়েছে। আর দুনিয়াতে জিনদের ইতিপূর্বেকার উৎপাত ও অনাচার সম্বন্ধে ফেরেশতারা আগে থেকেই অবহিত ছিল, সেকারণ তারা মানুষ সম্বন্ধেও একইরূপ ধারণা পোষণ করেছিল এবং প্রশ্নের জবাবে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, 'আল্লাহ জিন জাতিকে আগেই সৃষ্টি করেন গনগনে আগুন থেকে' (হিজর ১৫/২৭)। কিন্তু তারা অবাধ্যতার চূড়ান্ত করে।

আদমকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ঐসব বস্তুর নাম জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তারা তা বলতে পারল না। তখন আল্লাহ আদমকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সবকিছুর নাম বলে দিলেন। ফলে ফেরেশতারা অকপটে তাদের পরাজয় মেনে নিল এবং আল্লাহর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করে বলল, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিময়' (বাক্বারাহ ২/৩২)। অতঃপর আল্লাহ তাদের সবাইকে আদমের সম্মুখে সম্মানের সিজদা করতে বললেন। সবাই সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল ও অহংকারে স্ফীত হয়ে প্রত্যাখ্যান করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল (বাক্বারাহ ২/৩৪)। ইবলীস ঐ সময় নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলল, 'আমি ওর চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে'। আল্লাহ বললেন, তুই বের হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত, তোর উপরে আমার অভিশাপ রইল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' (ছোয়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ'রাফ ৭/১২)।

[9]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬৫।

[10]. বুখারী হা/৪৭২৭ 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা কাহফ।

সিজদার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য

আদমকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সিজদা করার কথা বলে দিয়েছিলেন (হা-মীম সাজদাহ/ফুছসালাত ৪১/১১)। তাছাড়া কুরআনের বর্ণনা সমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসাবে ছিল না, বরং ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই সিজদা কখনোই আদমের প্রতি ইবাদত পর্যায়ের ছিল না। বরং তা ছিল মানবজাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাদেরকে সকল কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দানের প্রতীকী ও সম্মান সূচক সিজদা মাত্র।

ওদিকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও ইবলীস কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে অস্বীকার করেনি। বরং আল্লাহ যখন তাকে 'অভিসম্পাৎ' করে জান্নাত থেকে চিরদিনের মত বিতাড়িত করলেন, তখন সে আল্লাহ্কে 'রব' হিসাবেই সম্বোধন করে প্রার্থনা করল,

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ-َ

'হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন' (হিজর ১৫/৩৬, ছোয়াদ ৩৮/৭৯)। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানারূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত' (হিজর ১৫/৩৪-৪০; ছোয়াদ ৩৮/৭৯-৮৩)। আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি নেমে যাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি নীচুতমদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তোমার অহংকার করার অধিকার নেই' (আ'রাফ ৭/১৩)। উল্লেখ্য যে, ইবলীস জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হ'লেও মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।[11] আর এটা ছিল মানুষের পরীক্ষার জন্য। শয়তানের ধোঁকার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থকাম হবে। মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের সিজদা করা ও

ইবলীসের সিজদা না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যেন প্রতি পদে পদে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে।

[11]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘ওয়াসওয়াসা’ অনুচ্ছেদ।

আদমের পাঁচটি শ্রেষ্ঠত্ব

(১) আল্লাহ তাকে নিজ দু’হাতে সৃষ্টি করেছেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)। (২) আল্লাহ নিজে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন (ছোয়াদ ৩৮/৭২)। (৩) আল্লাহ তাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন (বাক্বারাহ ২/৩১)। (৪) তাকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন (বাক্বারাহ ২/৩৪)। (৫) আদম একাই মাত্র মাটি থেকে সৃষ্ট। বাকী সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট (সাজদাহ ৩২/৭-৯)।

ইবলীসের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ ছিল তার ক্বিয়াস। সে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করে বলেছিল, ‘আমি আদমের চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দয়ে’ (হিজর ২৯)। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, اول من قاس ابليس ‘প্রথম ক্বিয়াস করেছিল ইবলীস’। হাসান বছরীও অনুরূপ বলেছেন।[12]

[12]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬৬।

নারী জাতি পুরুষেরই অংশ এবং তার অনুগত সিজদা অনুষ্ঠানের পর আল্লাহ আদমের জুড়ি হিসাবে তার অবয়ব হ’তে একাংশ নিয়ে অর্থাৎ তার পাঁজর হ’তে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন[13] মাটি থেকে সৃষ্ট হওয়া আদমের নাম হ’ল ‘আদম’ এবং জীবন্ত আদমের পাঁজর হ’তে সৃষ্ট হওয়ায় তাঁর স্ত্রীর নাম হ’ল ‘হাওয়া’ (কুরতুবী)। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বললেন, ‘তোমরা দু’জন জান্নাতে বসবাস কর ও সেখান থেকে যা খুশী খেয়ে বেড়াও। তবে সাবধান! এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ’লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’ (বাক্বারাহ ২/৩৫)। এতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণের সিজদা কেবল আদমের জন্য ছিল, হাওয়ার জন্য নয়। দ্বিতীয়তঃ সিজদা অনুষ্ঠানের পরে আদমের অবয়ব থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়, পূর্বে নয়। তিনি পৃথক কোন সৃষ্টি ছিলেন না। এতে পুরুষের প্রতি নারীর অনুগামী হওয়া

প্রমাণিত হয়। আল্লাহ বলেন, ‘পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল’ (নিসা ৪/৩৪)। অতঃপর বহিষ্কৃত ইবলীস তার প্রথম টার্গেট হিসাবে আদম ও হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণার জাল নিক্ষেপ করল। সেমতে সে প্রথমে তাদের খুব আপনজন বনে গেল এবং নানা কথায় তাদের ভুলাতে লাগল। এক পর্যায়ে সে বলল, ‘আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঐ গাছটির নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ হ’ল এই যে, তোমরা তাহ’লে ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা এখানে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে’ (আ‘রাফ ৭/২০)। সে অতঃপর কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী’ (ঐ, ২১)। ‘এভাবেই সে আদম ও হাওয়াকে সম্মত করে ফেলল এবং তার প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে তারা উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল। ফলে সাথে সাথে তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা তড়িঘড়ি গাছের পাতা সমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (ঐ, ২২) তখন তারা অনুতপ্ত হ’য়ে বলল, قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين- ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’ (২৩)। ‘আল্লাহ তখন বললেন, তোমরা (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের অবস্থান হবে পৃথিবীতে এবং সেখানেই তোমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সম্পদরাজি ভোগ করবে’ (২৪)। তিনি আরও বললেন যে, ‘তোমরা পৃথিবীতেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে’ (আ‘রাফ ৭/২০-২৫)।

মানব সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِن رُّوحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْن-

‘স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি মিশ্রিত পচা কাদার শুকনো মাটি দিয়ে ‘মানুষ’ সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন আমি তার অবয়ব পূর্ণভাবে তৈরী করে ফেলব ও তাতে আমি আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদায় পড়ে যাবে’ (হিজর ১৫/২৮-২৯)। অন্যত্র তিনি বলেন,

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- (آل عمران-৬)

‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে আকার-আকৃতি দান করেছেন যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও মহা বিজ্ঞানী’ (আলে ইমরান ৩/৬)। তিনি আরও বলেন,

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ- (زمر-৬)

‘তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন একের পর এক স্তরে তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণের মধ্যে’ (যুমার ৩৯/৬)। তিনটি আবরণ হ’ল- পেট, রেহেম বা জরায়ু এবং জরায়ুর ফুল বা গর্ভাধার।

শুধু মানুষ নয়, উদ্ভিদরাজি, জীবজন্তু ও প্রাণীকুলের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। আর মাটি সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানিই হ’ল সকল জীবন্ত বস্ত্তর মূল (ফুরক্বান ২৫/৫৪)।

মৃত্তিকাজাত সকল প্রাণীর জীবনের প্রথম ও মূল একক (Unit) হচ্ছে ‘প্রোটোপ্লাজম’ (Protoplasm)। যাকে বলা হয় ‘আদি প্রাণসত্তা’। এ থেকেই সকল প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী একে Bomb shell বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মাটির সকল প্রকারের রাসায়নিক উপাদান। মানুষের জীবন বীজে প্রচুর পরিমাণে চারটি উপাদান পাওয়া যায়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন। আর আটটি পাওয়া যায় সাধারণভাবে সমপরিমাণে। সেগুলি হ’ল- ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার ও আয়রণ। আরও আটটি পর্দাথ পাওয়া যায় স্বল্প পরিমাণে। তাহ’ল: সিলিকন, মোলিবডেনাম, ফ্লুরাইন, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, কপার ও যিংক। কিন্তু এই সব উপাদান সংমিশ্রিত করে জীবনের কণা তথা ‘প্রোটোপ্লাজম’ তৈরী করা সম্ভব নয়। জনৈক বিজ্ঞানী দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এসব মৌল উপাদান সংমিশ্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাতে কোন জীবনের ‘কণা’ পরিলক্ষিত হয়নি। এই সংমিশ্রণ ও তাতে জীবন সঞ্চার আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মাটি থেকে সরাসরি আদমকে অতঃপর আদম থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করার পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ আদম সন্তানদের মাধ্যমে বনু আদমের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। এখানেও রয়েছে সাতটি স্তর। যেমন: মৃত্তিকার সারাংশ তথা প্রোটোপ্লাজম, বীর্য বা শুক্রকীট, জমাট রক্ত, মাংসপিন্ড, অস্থিমজ্জা, অস্থি পরিবেষ্টনকারী মাংস এবং সবশেষে রূহ সঞ্চারণ (মুমিনূন ২৩/১২-১৪; মুমিন ৪০/৬৭; ফুরক্বান ২৫/৪৪; তারেক্ব ৮৬/৫-৭)। স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে রক্ষিত ডিম্বকোষে প্রবেশ করার পর উভয়ের সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে (দাহর ৭৬/২)। উল্লেখ্য যে, পুরুষের একবার নির্গত লম্ফমান বীর্যে লক্ষ-কোটি শুক্রাণু থাকে। আল্লাহর হুকুমে তন্মধ্যকার একটি মাত্র শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই শুক্রকীট পুরুষ ক্রোমোজম Y অথবা স্ত্রী ক্রোমোজম X হয়ে থাকে। এর মধ্যে যেটি স্ত্রীর ডিম্বের X ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয়, সেভাবেই পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আল্লাহর হুকুমে।

মাতৃগর্ভের তিন তিনটি গাঢ় অন্ধকার পর্দার অন্তরালে এইভাবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে বেড়ে ওঠা প্রথমত: একটি পূর্ণ জীবন সত্তার সৃষ্টি, অতঃপর একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবান শিশু হিসাবে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়া কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন মানুষের পক্ষে এই অনন্য-অকল্পনীয় সৃষ্টিকর্ম আদৌ সম্ভব কী? মাতৃগর্ভের ঐ অন্ধকার গৃহে মানবশিশু সৃষ্টির সেই মহান কারিগর কে? কে সেই মহান আর্কিটেক্ট, যিনি ঐ গোপন কুঠরীতে পিতার ২৩টি ক্রোমোজম ও মাতার ২৩টি ক্রোমোজম একত্রিত করে সংমিশ্রিত বীর্য প্রস্তুত করেন? কে সেই মহান শিল্পী, যিনি রক্তপিন্ড আকারের জীবন টুকরাটিকে মাতৃগর্ভে পুষ্ট করেন? অতঃপর ১২০ দিন পরে তাতে রূহ সঞ্চার করে তাকে জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করেন এবং পূর্ণ-পরিণত হওয়ার পরে সেখান থেকে বাইরে ঠেলে দেন (আবাসা ৮০/১৮-২০)। বাপ-মায়ের স্বপ্নের ফসল হিসাবে নয়নের পুত্তলি হিসাবে? মায়ের গর্ভে মানুষ তৈরীর সেই বিস্ময়কর যন্ত্রের দক্ষ কারিগর ও সেই মহান শিল্পী আর কেউ নন, তিনি আল্লাহ! সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম!!

পুরুষ ও নারীর সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম লাভের তথ্য কুরআনই সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছে (দাহর ৭৬/২)। আধুনিক বিজ্ঞান এ তথ্য জনতে পেরেছে মাত্র গত শতাব্দীতে ১৮৭৫ সালে ও ১৯১২ সালে। তার পূর্বে এরিষ্টটল সহ সকল বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, পুরুষের বীর্যের কোন কার্যকারিতা নেই। রাসূলের হাদীছ বিজ্ঞানীদের এই মতকে

সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেছে।[15] কেননা সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সন্তান প্রজননে পুরুষ ও নারী উভয়ের বীর্য সমানভাবে কার্যকর।

উল্লেখ্য যে, মাতৃগর্ভে বীর্য প্রথম ৬ দিন কেবল বুদ্বুদ আকারে থাকে। তারপর জরায়ুতে সম্পর্কিত হয়। তিন মাসের আগে ছেলে বা মেয়ে সন্তান চিহ্নিত হয় না। চার মাস পর রূহ সঞ্চারিত হয়ে বাচ্চা নড়েচড়ে ওঠে ও আঙ্গুল চুষতে থাকে। যাতে ভূমিষ্ট হওয়ার পরে মায়ের স্তন চুষতে অসুবিধা না হয়। এ সময় তার কপালে চারটি বস্তু লিখে দেওয়া হয়। তার আজাল (হায়াত), আমল, রিযিক এবং সে ভাগ্যবান না দুর্ভাগা।[16]

এভাবেই জগত সংসারে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা এগিয়ে চলেছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই কেবল আল্লাহর হুকুম ব্যতীত। একারণেই আল্লাহ অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্যে বিতন্ডাকারী'। 'সে আমাদের সম্পর্কে নানারূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়, আর বলে যে, কে জীবিত করবে এসব হাড়গোড় সমূহকে, যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? (ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৮)।

[15]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৩-৪৩৪ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'গোসল' অনুচ্ছেদ।
[16]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২ 'ঈমান' অধ্যায় 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

জান্নাত থেকে পতিত হবার পর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে ছহীহ সনদে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ألست بربكم 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই? বনু আদমের কাছ থেকে এই বহুল প্রসিদ্ধ 'আহদে আলাস্ত' বা প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিটি তখনই নেওয়া হয়, যখন আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল না'মান (وادى نَعْمَان) নামক উপত্যকায়, যা পরবর্তীকালে 'আরাফাত'-এর ময়দান নামে পরিচিত হয়েছে।এর দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান পৃথিবীর বাইরে।

হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম)

নূহ (আঃ)-এর পরিচয়

আদম (আঃ) থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। যার শেষদিকে ক্রমবর্ধমান মানবকুলে শিরক ও কুসংস্কারের আবির্ভাব ঘটে এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে নবী ও রাসূল করে পাঠান। তিনি সাড়ে নয়শত বছরের দীর্ঘ বয়স লাভ করেছিলেন এবং সারা জীবন পথভোলা মানুষকে পথে আনার জন্য দাওয়াতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর কওম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে আল্লাহর গযবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপরে আরও কয়েকটি কওম আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে পরপর ধ্বংস হয়। এভাবে পৃথিবীতে আদি যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত ৬টি জাতির ঘটনা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআনের মাধ্যমেই জগদ্বাসী তাদের খবর জানতে পেরেছে। যাতে মুসলিম উম্মাহ ও পৃথিবীবাসী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। উক্ত ৬টি জাতি হ’ল- কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, কওমে লূত, মাদইয়ান ও কওমে ফেরাঊন। অবশ্য কুরআনে এ তালিকায় কওমে ইবরাহীমের কথাও এসেছে (তওবাহ ৯/৭০)। যদিও তারা একত্রে ধ্বংস হয়নি। তবে ইবরাহীমের ভাতিজা লূত-এর কওম একত্রে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। আমরা এখানে প্রথমে নূহ (আঃ) ও তাঁর কওম সম্পর্কে আলোচনা করব।

নূহ (আঃ)-এর পরিচয় :

‘আবুল বাশার ছানী’ (ابوالبشرالثانى) বা মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা বলে খ্যাত নূহ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন পিতা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ছিলেন দুনিয়াতে **১**ম রাসূল।[1]

নূহ (আঃ)-এর চারটি পুত্র ছিলঃ সাম, হাম, ইয়াফিছ ও ইয়াম অথবা কেন‘আন।[2] প্রথম তিনজন ঈমান আনেন। কিন্তু শেষোক্ত জন কাফের হয়ে প্লাবনে ডুবে মারা যায়। নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতে তাঁর কওমের হাতেগণা মাত্র কয়েকজন ঈমানদার ব্যক্তি সাড়া দেন এবং তারাই প্লাবনের সময় নৌকারোহণের মাধ্যমে নাজাত পান। নূহের কিশতীতে কয়জন ঈমানদার ব্যক্তি আরোহণ করে নাজাত পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে কুরআনে বা হাদীছে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। অমনিভাবে কিশতীটি কত বড় ছিল, কিভাবে ও

কত দিনে তৈরী হয়েছিল, এসব বিষয়েও কিছু বর্ণিত হয়নি। এসব বিষয়ে যা কিছু বিভিন্ন তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে, সবকিছুর ভিত্তি হ’ল ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ। যার সঠিক কোন ভিত্তি নেই।[3] ইমাম তিরমিযী হযরত সামুরা (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, নূহের প্লাবন শেষে কেবল তাঁর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণই অবশিষ্ট ছিল।[4] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন যে,

سام أبو العرب وحام أبو الحبش و يافث أبو الروم.

‘সাম আরবের পিতা, হাম হাবশার পিতা এবং ইয়াফেছ রোমকদের (গ্রীক) পিতা’।[5]ইবনু আববাস ও ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, পরবর্তী মানব জাতি সবাই নূহের বংশধর’।[6]

আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْن. ‘আমরা তার (নূহের) বংশধরগণকেই অবশিষ্ট রেখেছি’ (ছাফফাত ৩৭/৭৭)। ফলে ইহুদী-খৃষ্টান সহ সকল ধর্মমতের লোকেরা নূহ (আঃ)-কে তাদের পিতা হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সাম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে বড়। তিনি ছিলেনأبو العرب বা আরব জাতির পিতা। তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই ছিলেন হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)। ইসহাকের বংশধরগণের মধ্যে ছিলেন ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইউনুস, ইলিয়াস, ঈসা প্রমুখ নবী ও রাসূলগণ। হাম ও ইয়াফেছ-এর বংশধরগণের নিকটে প্রেরিত নবীগণের নাম জানা যায়নি। তবে আরবদের মধ্যকার চারজন নবী ছিলেন হূদ, ছালেহ, শু‘আয়েব ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)।[7] অধিকাংশ ছাহাবীর মতে নূহ (আঃ) ছিলেন ইদরীস (আঃ)-এর পূর্বেকার নবী।[8] তিনিই ছিলেন জগতের প্রথম রাসূল।[9] ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, তিনি চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত ছিলেন।[10] ফলে সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি নবী হিসাবে শিরকে নিমজ্জিত হঠকারী কওমকে দাওয়াত দেন। প্লাবনের পর তাঁর সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুনভাবে আবাদ শুরু হয় এবং তাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। এ কারণে তাঁকে ‘মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা’ বলা হয়।

আদম (আঃ) ৯৬০ বছর বেঁচে ছিলেন[11] এবং নূহ (আঃ) ৯৫০ বছর জীবন পেয়েছিলেন (আনকাবূত ২৯/১৪)। উল্লেখ্য যে, আদম ও নূহ (আঃ)-এর দীর্ঘ বয়স আল্লাহর বিশেষ দান ও তাঁদের মু'জেযা স্বরূপ ছিল। নূহ (আঃ)-এর পুরুষানুক্রমিক বয়স তাঁর ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। নূহ (আঃ) ইরাকের মূছেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যতঃ সভ্য হ'লেও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরায় ৮১টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[12]

[1]. মুসলিম হা/৩২৭ 'ঈমান' অধ্যায় ৮৪ অনুচ্ছেদ। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

[2]. কুরতুবী, সূরা আনকাবূত ১৪ আয়াতের ব্যাখ্যা।

[3]. দ্রঃ কুরতুবী টীকা সূরা হূদ ৩৮-৪০ আয়াত।

[4] তাফসীর ইবনে কাছীর সূরা ছাফফাত ৭৭ আয়াতের ব্যাখ্যা।

[5]. তিরমিযী হা/৩২৩০-৩১; আলবানী সনদ 'যঈফ' বলেছেন; আহমাদ হা/১৯৯৮২ তাহকীকঃ হামযাহ আহমাদ; হাকেম ২/৫৪৬ পৃঃ; তিনি একে 'ছহীহ' বলেছেন ও যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

[6]. ঐ।

[7]. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত : মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩), পৃঃ ১৪৩-৪৪, ছহীহ ইবনু হিববান, আবু যর গেফারী হ'তে মরফূ সূত্রে; সনদ যঈফ।

[8]. বাহরে মুহীত-এর বরাতে তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃঃ ৪৫২ সূরা আ'রাফ ৫৯-৬৪ আয়াত।

[9]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২, 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।

[10]. কুরতুবী, ইবনু কাছীর; সূরা আনকাবূত ১৪-১৫ আয়াত।

[11]. তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী অত্র হাদীছকে 'হাসান ছহীহ' বলেছেন। অতঃপর 'সালাম' অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৪৬৬২ নং হাদীছটিকে তিনি 'হাসান গরীব' বলেছেন। যেখানে আদম (আঃ)-এর বয়স ৯৪০ বলা হয়েছে। ছাহেবে মিরক্বাত ও ছাহেবে তুহফা প্রথমোক্ত হাদীছকে 'অগ্রগণ্য' (أرجح) বলেছেন।

[12]. যথাক্রমে আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪; নিসা ৪/১৬৩; আন'আম ৬/৬, ৮৪; আ'রাফ ৭/৫৯, ৬৯, ১৩৩= ৩; তওবা ৯/৭০; ইউনুস ১০/৭১; হূদ ১১/২৫, ৩২, ৩৬, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৮৯= ৮; ইবরাহীম ১৪/৯; ইসরা ১৭/৩, ১৭; মারিয়াম ১৯/৫৮; আম্বিয়া ২১/৭৬; হজ্জ ২২/৪২; মুমিনূন ২৩/২৩; ফুরক্বান ২৫/৩৭; শো'আরা ২৬/১০৫, ১০৬, ১১৬; আনকাবূত ২৯/১৪-১৫; আহযাব ৩৩/৭; ছাফফাত ৩৭/৭৫, ৭৯; ছোয়াদ ৩৮/১২; গাফের/মুমিন ৪০/৫, ৩১-৩৩= ৪; শূরা ৪২/১৩; ক্বাফ ৫০/১২; যারিয়াত ৫১/৪৬; নাজম ৫৩/৫২; ক্বামার ৫৪/৯-১৬= ৮; হাদীদ ৫৭/২৬; তাহরীম ৬৬/১০; নূহ ৭১/১-২৮= ২৮। সর্বমোট = ৮১ টি।

তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা আদম (আঃ)-এর সময়ে ঈমানের সাথে শিরক ও কুফরের মুকাবিলা ছিল না। তখন সবাই তওহীদের অনুসারী একই উম্মতভুক্ত ছিল (বাক্বারাহ ২/২১৩)। তাঁর শরী'আতের অধিকাংশ বিধানই ছিল পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কালের বিবর্তনে মানুষের মধ্য শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটে। নূহের কওম ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাস্র প্রমুখ মৃত নেককার লোকদের অসীলায় আখেরাতে মুক্তি পাবার আশায় তাদের পূজা শুরু করে। এই পূজা তাদের কবরেও হ'তে পারে, কিংবা তাদের মূর্তি বানিয়েও হ'তে পারে। মুহাম্মাদ ইবনু ক্বায়েস বলেন, আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়কালের এই পাঁচজন ব্যক্তি নেককার ও সৎকর্মশীল বান্দা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্ত অনুসারীগণকে শয়তান এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, এইসব নেককার মানুষের মূর্তি সামনে থাকলে তাদের দেখে আল্লাহর প্রতি ইবাদতে অধিক আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ফলে তারা তাদের মূর্তি বানায়। অতঃপর উক্ত লোকদের মৃত্যুর পরে তাদের পরবর্তীগণ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ঐ মূর্তিগুলিকেই সরাসরি উপাস্য হিসাবে পূজা শুরু করে দেয়। তারা এইসব মূর্তির অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত'।[13] আর এভাবেই পৃথিবীতে প্রথম মূর্তিপূজার শিরকের সূচনা হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম শিরক হ'ল নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তিপূজা। যা আজও প্রায় সকল ধর্মীয় সমাজে চালু আছে এবং বর্তমানে যা মুসলিম সমাজে স্থানপূজা, কবর পূজা, ছবি-প্রতিকৃতি, মিনার ও ভাষ্কর্য

পূজায় রূপ নিয়েছে। উক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য ও তাদের প্রতি ভক্তি লোকদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রোথিত হয়েছিল যে, তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনকালে তাদের নাম উল্লেখ করত। এতদ্ব্যতীত তারা নানাবিধ সামাজিক অনাচারে ডুবে গিয়েছিল। সম্প্রদায়ের এইরূপ পতন দশায় আল্লাহ তাদের হেদায়াতের জন্য নূহ (আঃ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন (আ‘রাফ ৭/৬১)।

[13]. ইবনু কাছীর, সূরা নূহ। বুখারী মওকুফ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হ’তে এটি বর্ণনা করেন ‘তাফসীর’ অধ্যায় হা/৪৯২০।

[14]. বুখারী ‘তাফসীর’ অধ্যায় হা/৪৯২০; তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ।

[15]. তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নূহ।

স্বীয় কওমের প্রতি নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত

আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ- (نوح-(১-৪

‘আমরা নূহকে তার কওমের নিকটে প্রেরণ করলাম তাদের উপরে মর্মান্তিক আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করার জন্য’। ‘নূহ তাদেরকে বলল, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী’। ‘এ বিষয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর’। ‘তাতে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে, তখন তা এতটুকুও পিছানো হবে না। যদি তোমরা তা জানতে’ (নূহ ৭১/১-৪)।

অতঃপর তিনি তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদতে ফিরিয়ে আনার জন্য বান্দার উপরে আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ ও অগণিত নে‘মতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقا، وَ َجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً، وَاللهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً، وَالله ُجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً- (نوح-১৫-২০)

'তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন'। 'সেখানে তিনি চন্দ্রকে রেখেছেন আলো রূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপ রূপে'। 'আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্গত করেছেন'। 'অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন ও আবার পুনরুত্থিত করবেন'। 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা সদৃশ'। 'যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত রাস্তাসমূহে' (নূহ ৭১/১৫-২০)।

হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্ভবত: এগারোতম অধঃস্তন পুরুষ। নূহ থেকে ইবরাহীম পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত ছালেহ (আঃ)-এর প্রায় ২০০ বছর পরে ইবরাহীমের আগমন ঘটে। ঈসা থেকে ব্যবধান ছিল ১৭০০ বছর অথবা প্রায় ২০০০ বছরের। তিনি ছিলেন 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা এবং তাঁর স্ত্রী 'সারা' ছিলেন 'উম্মুল আম্বিয়া' বা নবীগণের মাতা। তাঁর স্ত্রী সারার পুত্র হযরত ইসহাক্ব-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধর 'বনু ইসরাঈল' নামে পরিচিত এবং অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে জন্ম নেন বিশ্বনবী ও শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ(ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। যাঁর অনুসারীগণ 'উম্মতে মুহাম্মাদী' বা 'মুসলিম উম্মাহ' বলে পরিচিত।

বাবেল হ'তে তিনি কেন'আনে (ফিলিস্তীন) হিজরত করেন। সেখান থেকে বিবি সারা-র বংশজাত নবীগণের মাধ্যমে আশপাশে সর্বত্র তাওহীদের দাওয়াত বিস্তার লাভ করে। অপর স্ত্রী হাজেরার পুত্র ইসমাঈলের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ ও তার আশপাশ এলাকায় তাওহীদের প্রচার ও প্রসার হয় এবং অবশেষে এখানেই সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে। এভাবে ইবরাহীমের দুই স্ত্রীর বংশজাত নবীগণ বিশ্বকে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দেহসৌষ্ঠব ও চেহারা মুবারক পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর ন্যায় ছিল। যা তিনি মে'রাজ থেকে ফিরে এসে উম্মতকে খবর দেন।[1]

[1]. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৬ 'মে'রাজ' অনুচ্ছেদ।

আবুল আম্বিয়া ও সাইয়েদুল আম্বিয়া

ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন ইহুদী-খৃষ্টান-মুসলমান সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিতা। কেননা আদম (আঃ) হ'তে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত ১ লাখ ২৪ হাযার পয়গম্বরের প্রায় সকলেই ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوْحاً وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ- (آل عمران-৩৩)

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইবরাহীম ও আলে ইমরানকে বিশ্ববাসীর উপরে নির্বাচিত করেছেন’ (আলে ইমরান ৩/৩৩)। এই নির্বাচন ছিল বিশ্ব সমাজে আল্লাহর তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। ইবরাহীম ছিলেন নবীগণের পিতা এবং পুত্র মুহাম্মাদ ছিলেন নবীগণের নেতা, এ বিষয়টি সর্বদা মুমিনের মানসপটে জাগরুক রাখার জন্য দৈনিক ছালাতের শেষ বৈঠকে পঠিত দরূদের মধ্যে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের উপরে এবং উভয়ের পরিবার বর্গের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষণের জন্য দো‘আ করার বিধান রাখা হয়েছে। ইবরাহীমের বংশে বরকত হ’ল নবুঅত ও ঐশী কিতাবের বরকত এবং মুহাম্মাদের ও তাঁর বংশে বরকত হ’ল বিজ্ঞানময় কুরআন ও হাদীছ এবং তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বরকত।

ইবরাহীম ও তাঁর বংশধর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ- (العنكبوت-২৭(

‘আমরা তাকে দান করলাম ইসহাক্ব ও ইয়াকূবকে এবং তার বংশধরগণের মধ্যে প্রদান করলাম নবুঅত ও কিতাব। তাকে আমরা দুনিয়াতে পুরষ্কৃত করলাম। নিশ্চয়ই পরকালে সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (আনকাবূত ২৯/২৭)।

অতঃপর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً- (الأحزاب ২১)-

‘যারা আল্লাহ ও শেষদিবসের (অর্থাৎ আখেরাতে মুক্তির) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক হারে স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (মুহাম্মাদের) মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে’ (আহযাব ৩৩/২১)। অতঃপর তাঁর পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْراً-(الأحزاب-৩৩(

‘হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে’ (আহযাব ৩৩/৩৩)। শেষ যামানায় ইমাম মাহদী আসবেন হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশধরগণের মধ্য হ’তে এ বিষয়ে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[2] এইভাবে ইবরাহীম ও মুহাম্মাদের নাম পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত দিকে দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হ’তে থাকবে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

[2]. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৪৫৩-৫৪; হাকেম ৪/৫৫৭-৫৮ পৃঃ প্রভৃতি।

নবী ইবরাহীম

আদম, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা প্রমুখ দু’তিন জনের ব্যতিক্রম বাদে নূহ (আঃ) সহ অন্যান্য সকল নবীর ন্যায় ইবরাহীমকেও আমরা ধরে নিতে পারি যে, তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেন। উম্মতে মুসলিমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) পশ্চিম ইরাকের বছরার নিকটবর্তী ‘বাবেল’ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরটি পরবর্তীতে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে

জাদুর জন্য বিখ্যাত হয় (বাক্বারাহ ২/১০২)।

এখানে তখন কালেডীয় (كلدانى) জাতি বসবাস করত। তাদের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন নমরূদ। যিনি তৎকালীন পৃথিবীতে অত্যন্ত উদ্ধত ও অহংকারী সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় চারশো বছর রাজত্ব করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজে ‘উপাস্য’ হবার দাবী করেন।[3] আল্লাহ তারই মন্ত্রী ও প্রধান পুরোহিত ‘আযর’-এর ঘরে বিশ্বনেতা ও বিশ্ব সংস্কারক নবী ইবরাহীমকে মুখ্যত: কালেডীয়দের প্রতি প্রেরণ করেন। ইবরাহীমের নিজ পরিবারের মধ্যে কেবল সহধর্মিনী ‘সারা’ ও ভ্রাতুষ্পুত্র ‘লূত’ মুসলমান হন।

স্ত্রী ‘সারা’ ছিলেন আদি মাতা বিবি হাওয়ার পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মহিলা। তিনি ১২৭ বছর বয়সে ‘হেবরনে’ মৃত্যু ববণ করেন ও সেখানেই কবরস্থ হন।[4] সারার মৃত্যুর পরে ইবরাহীম ক্বানতূরা বিনতে ইয়াক্বতিন ও হাজূন বিনতে আমীন নামে পরপর

দুজন নারীকে বিয়ে করেন এবং ৬+৫=১১টি সন্তান লাভ করেন।[5] তিনি প্রায় দু’শো বছর জীবন পান বলে কথিত আছে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ২৫টি সূরায় ২০৪টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[6] নিম্নে আমরা আয়াত সমূহ থেকে নিয়ে সাধ্যতম সাজিয়ে কাহিনী আকারে পেশ করার চেষ্টা পাব ইনশাআল্লাহ।

[3]. তারীখুল আম্বিয়া পৃঃ ৬৮।

[4]. তারীখুল আম্বিয়া, পৃঃ ৭৪।

[5]. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৬৪ পৃ:।

[6]. যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/১২৪-১৩৩=১০; ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০; আলে ইমরান ৩/৩৩, ৩৪, ৬৫-৬৮=৪; ৮৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭; নিসা ৪/৫৪, ১২৫, ১৬৩; আন‘আম ৬/৭৪-৮৩=১০; ১৬১; তওবাহ ৯/৭০, ১১৪; হূদ ১১/৬৯-৭৬=৮; ইউসুফ ১২/৬, ৩৮; ইবরাহীম ১৪/৩৫-৪১=৭; হিজর ১৫/৫১-৬০=১০; নাহ্ল ১৬/১২০-১২৩=৪; মারিয়াম ১৯/৪১-৫০=১০; ৫৮; আম্বিয়া ২১/৫১-৭৩=২৩; হজ্জ ২২/২৬, ৪৩, ৭৮; শো‘আরা ২৬/৬৯-৮৯=২১; আনকাবূত ২৯/১৬-২৭=১২; ৩১; আহযাব ৩৩/৭; ছাফফাত ৩৭/৮৩-১১৩=৩১; ছোয়াদ ৩৮/৪৫-৪৭=৩; শূরা ৪২/১৩; যুখরুফ ৪৩/২৬, ২৭; যারিয়াত ৫১/২৪-৩৪=১১; নাজম ৫৩/৩৭; হাদীদ ৫৭/২৬, ২৭; মুমতাহানা ৬০/৪-৬=৩; আ‘লা ৮৭/১৯, সর্বমোট = ২০৪টি

সামাজিক অবস্থা

ইবরাহীমের আবির্ভাবকালীন সময়ে কালেডীয় সমাজ শিক্ষা ও সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ছিল। এমনকি তারা সৌরজগত নিয়েও গবেষণা করত। কিন্তু অসীলা পূজার রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা আল্লাহকে পাবার জন্য বিভিন্ন মূর্তি ও তারকা সমূহের পূজা করত। হযরত ইবরাহীম উভয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে প্রেরিত হন।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দাওয়াত : মূর্তিপূজারী কওমের প্রতি-

সকল নবীর ন্যায় ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কওমকে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَ◌َإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-(العنكبوت-(১৭-১৬

'স্মরণ কর ইবরাহীমকে, যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ'। 'তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর নিকটে রিযিক তালাশ কর। তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' (আনকাবূত ৩৩/১৬-১৭)।

ইবরাহীম (আঃ) উক্ত দাওয়াতের মধ্যে কেবল আল্লাহর স্বীকৃতি কামনা করেননি। বরং স্বীকৃতির ফলাফল (ثمرة الإقرار) আশা করেছিলেন। অর্থাৎ তারা যেন আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে মান্য করে এবং কোন অবস্থায় তা লংঘন না করে। কেননা স্বীকৃতির বিপরীত কাজ করা তা লংঘন করার শামিল।

পিতার প্রতি

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقاً نَّبِيًّا، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً، يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً، يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيّاً، يَا أَبَتِ إِنِّيْ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً-(مريم(৪৫-৪১

'তুমি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও নবী'(১৯/৪১)। 'যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! তুমি তার পূজা কেন কর, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না?(৪২)। 'হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব'(৪৩)। 'হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য'(৪৪)। 'হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি যে, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ

করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবে’ (মারিয়াম ১৯/৪১-৪৫)।

পুত্রের আকুতিপূর্ণ দাওয়াতের উত্তরে পিতা বলল, قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِيْ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا- (مريم ৪৬)- ‘হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই পাথর মেরে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব। তুমি আমার সম্মুখ হ’তে চিরতরের জন্য দূর হয়ে যাও’ (মারিয়াম ১৯/৪৬)।

ইবরাহীমের জবাব

পিতার এই কঠোর ধমকি শুনে পুত্র ইবরাহীম বললেন,

قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيّاً- (مريم-৪৮-৪৭)

‘তোমার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি মেহেরবান’। ‘আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা পূজা কর তাদেরকে। আমি আমার পালনকর্তাকে আহবান করব। আশা করি আমার পালনকর্তাকে আহবান করে আমি বঞ্চিত হব না’ (মারিয়াম ১৯/৪৭-৪৮)।

পিতাকে ও নিজ সম্প্রদায়কে একত্রে দাওয়াত

আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيْمَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ، قَالُوْا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ، قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ، أَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ، قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُوْنَ، قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ، أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ، وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ، وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ، وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَن يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ، رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْماً وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ، وَاجْعَل لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِيْنَ، ◌َاجْعَلْنِيْ مِن وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ، وَاغْفِرْ لِأَبِيْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ، وَلاَ تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ، يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ، إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ، وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ، مِنْ دُوْنِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ، فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ، وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُوْنَ،

قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ، تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ، إِذْ نُسَوِّيْكُم بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُوْنَ، فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ، وَلاَ صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِيْنَ- (الشعراء-৬৯-১০৪)

'আর তাদেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন'(শো'আরা ২৬/৬৯)। 'যখন সে স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, তোমরা কিসের পূজা কর'?(৭০)। তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সর্বদা এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি'(৭১)। 'সে বলল, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি'?(৭২)। 'অথবা তারা তোমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি'?(৭৩)। 'তারা বলল, না। তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত'(৭৪)। ইবরাহীম বলল, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের তোমরা পূজা করে আসছ'?(৭৫)। 'তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা'(৭৬)। 'তারা সবাই আমার শত্রু, বিশ্ব পালনকর্তা ব্যতীত'(৭৭)। 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন' (৭৮)। 'যিনি আমাকে আহার দেশ ও পানীয় দান করেন' (৭৯)। 'যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন'(৮০)। 'যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন' (৮১)। 'আশা করি শেষ বিচারের দিন তিনি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন' (৮২)। 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর'(৮৩)। 'এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর' (৮৪)। 'তুমি আমাকে নে'মতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর'(৮৫)। (হে প্রভু) 'তুমি আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত'(৮৬) (হে আল্লাহ) 'পুনরুত্থান দিবসে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত কর না' (৮৭)। 'যে দিনে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না' (৮৮) 'কিন্তু যে ব্যক্তি সরল হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে' (৮৯)। '(ঐ দিন) জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে'(৯০)। 'এবং জাহান্নাম বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে'(৯১)। '(ঐ দিন) তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায় যাদেরকে তোমরা পূজা করতে'?(৯২) 'আল্লাহর পরিবর্তে। তারা কি (আজ) তোমাদের সাহায্য করতে পারে কিংবা তারা কি কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে পারে'? (৯৩)। 'অতঃপর তাদেরকে এবং (তাদের মাধ্যমে) পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে'(৯৪) 'এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে' (৯৫)। 'তারা সেখানে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে বলবে'(৯৬) 'আল্লাহর কসম! আমরা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিলাম'(৯৭), 'যখন আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কথিত উপাস্যদেরকে) বিশ্বপালকের সমতুল্য গণ্য করতাম'(৯৮)।'আসলে

আমাদেরকে পাপাচারীরাই পথভ্রষ্ট করেছিল' (৯৯)। 'ফলে (আজ) আমাদের কোন সুফারিশকারী নেই' (১০০) 'এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই'(১০১)। 'হায়! যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ পেতাম, তাহ'লে আমরা ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম'(১০২)। 'নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। বস্ততঃ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না' (১০৩)। 'নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা পরাক্রান্ত ও দয়ালু' (শো'আরা ২৬/৬৯-১০৪)।

স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়ের নিকটে ইবরাহীমের দাওয়াত ও তাদের জবাবকে আল্লাহ অন্যত্র নিম্নরূপে বর্ণনা করেন। যেমন-

إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءنَا لَهَا عَابِدِيْنَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ، قَالُوْا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِيْنَ، قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ، وَتَاللهِ لَأَكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ- (الأنبياء-(৫২-৫৭)

ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, 'এই মূর্তিগুলি কী যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ'?(আম্বিয়া ২১/৫২)। 'তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপ পূজা করতে দেখেছি'(৫৩)। 'সে বলল, তোমরা প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও' (৫৪)। 'তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ এসেছ, না কেবল কৌতুক করছ'? (৫৫)। 'সে বলল, না। তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে তোমাদের উপর অন্যতম সাক্ষ্যদাতা'(৫৬)। 'আল্লাহর কসম! যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা কিছু করে ফেলব' (আম্বিয়া ২১/৫২-৫৭)।

হযরত লূত (আলাইহিস সালাম)

পরিচয়

হযরত লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি ‘বাবেল’ শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন‘আনে চলে আসেন। আল্লাহ লূত (আঃ)-কে নবুঅত দান করেন এবং কেন‘আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী ‘সাদূম’ অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমূরা, দূমা, ছা‘বাহ ও ছা‘ওয়াহ [1] নামে বড় বড় পাঁচটি শহর ছিল। কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে ‘মু’তাফেকাহ’ (নাজম ৫৩/৫৩) বা ‘মু’তাফেকাত’ (তওবাহ ৯/৭০, হাক্কাহ ৬৯/৯) শব্দে বর্ণনা করেছে। যার অর্থ ‘জনপদ উল্টানো শহরগুলি’। এ পাঁচটি শহরের মধ্যে সাদূম (سدوم) ছিল সবচেয়ে বড় এবং সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হ’ত। হযরত লূত (আঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। এখানকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্য-শ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। এসব ঐতিহাসিক তথ্য বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ‘সাদূম’ সম্পর্কে সকলে একমত। বাকী শহরগুলির নাম কি, সেগুলির সংখ্যা তিনটি, চারটি না ছয়টি, সেগুলিতে বসবাসকারী লোকজনের সংখ্যা কয়শত, কয় হাযার বা কয় লাখ ছিল, সেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এগুলি ইস্রাঈলী বর্ণনা, যা কেবল ইতিহাসের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কুরআন ও হাদীছে শুধু মূল বিষয়বস্তুর বর্ণনা এসেছে, যা মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয়।

উল্লেখ্য যে, লূত (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১৫টি সূরায় ৮৭টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[2]

[1]. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, হূদ ৮৩।

[2]. যথাক্রমে সূরা আ‘রাফ ৭/৮০-৮৪=৫; তওবাহ ৯/৭০; হূদ ১১/৭০, ৭৪, ৭৬-৮৩=৮; ৮৯; হিজর ১৫/৫৮-৭৭=২০; আম্বিয়া ২১/৭৪-৭৫; হজ্জ ২২/৪৩; শো‘আরা ২৬/১৬০-১৭৫=১৬; নমল ২৭/৫৪-৫৮=৫; আনকাবূত ২৯/৩১-৩৫=৫; ছাফফাত ৩৭/১৩৩-১৩৮=৬; ছোয়াদ ৩৮/১৩-১৫=৩; ক্বাফ ৫০/১৩-১৪; যারিয়াত ৫১/৩১-৩৭=৭; তাহরীম ৬৬/১০; হা-ক্কাহ ৬৯/৯-১০। সর্বমোট = ৮৭টি

লূত (আঃ)-এর দাওয়াত

লূত (আঃ)-এর কওম আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। দুনিয়াবী উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার কারণে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। পূর্বেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ন্যায় তারা চূড়ান্ত বিলাস-ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার ও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি পুংমৈথুন বা সমকামিতার মত নোংরামিতে তারা লিপ্ত হয়েছিল, যা ইতিপূর্বেকার কোন জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়নি। জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হঠকারী এই কওমের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ লূত (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। কুরআনে লূতকে 'তাদের ভাই' (শো'আরা ২৬/১৬১) বলা হ'লেও তিনি ছিলেন সেখানে মুহাজির। নবী ও উম্মতের সম্পর্কের কারণে তাঁকে 'তাদের ভাই' বলা হয়েছে। তিনি এসে পূর্বেকার নবীগণের ন্যায় প্রথমে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বললেন,

إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، (الشعراء-১৬২-১৬৪)

'আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্য তোমাদের নিকটে কোনরূপ প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপ্রভু আল্লাহ দিবেন' (শো'আরা ২৬/১৬২-১৬৫)। অতঃপর তিনি তাদের বদভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ- 'বিশ্ববাসীর মধ্যে কেন তোমরাই কেবল পুরুষদের নিকটে (কুকর্মের উদ্দেশ্যে- আ'রাফ ৭/৮১) এসে থাক'? 'আর তোমাদের স্ত্রীগণকে বর্জন কর, যাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের পালনকর্তা সৃষ্টি করেছেন? নিঃসন্দেহে তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়' (শো'আরা ২৬/১৬৫-১৬৬)। জবাবে কওমের নেতারা বলল,

لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ، قَالَ إِنِّيْ لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِيْنَ- (الشعراء-১৬৭-১৬৮)-

'হে লূত! যদি তুমি (এসব কথাবার্তা থেকে) বিরত না হও, তাহ'লে তুমি অবশ্যই বহিষ্কৃত হবে'। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের এইসব কাজকে ঘৃণা করি' (শো'আরা ২৬/১৬৭-১৬৮)। তিনি তাদের তিনটি প্রধান নোংরামির কথা উল্লেখ করে বলেন,

وَلُوْطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ، قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ- (العنكبوت-২৮-৩০)-

'তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ কখনো করেনি'। 'তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে গর্হিত কর্ম করছ'? জবাবে তাঁর

সম্প্রদায় কেবল একথা বলল যে, আমাদের উপরে আল্লাহর গযব নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও'। তিনি তখন বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা! এই দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর' (আনকাবূত ২৯/২৮-৩০; আ'রাফ ৭/৮০)।

লূত (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি

নিজ কওমের প্রতি হযরত লূত (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি মর্মান্তিক রূপে প্রতিভাত হয়। তারা এতই হঠকারী ও নিজেদের পাপকর্মে অন্ধ ও নির্লজ্জ ছিল যে, তাদের কেবল একটাই জবাব ছিল, তুমি যে গযবের ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি? কিন্তু কোন নবীই স্বীয় কওমের ধ্বংস চান না। তাই তিনি ছবর করেন ও তাদেরকে বারবার উপদেশ দিতে থাকেন। তখন তারা অধৈর্য হয়ে বলে যে, أَخْرِجُوْهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ- 'এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। এই লোকগুলি সর্বদা পবিত্র থাকতে চায়' (আ'রাফ ৭/৮২; নমল ২৭/৫৬)। তারা আল্লাহভীতি থেকে বেপরওয়া হয়ে অসংখ্য পাপকর্মে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কুরআন তাদের তিনটি প্রধান পাপ কর্মের উল্লেখ করেছে। (১) পুংমৈথুন (২) রাহাজানি এবং (৩) প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্ম করা (আনকাবূত ২৯/২৯)।

বলা বাহুল্য, সাদূমবাসীদের পূর্বে পৃথিবীতে কখনো এরূপ কুকর্ম কেউ করেছে বলে শোনা যায়নি। এমনকি অতি বড় মন্দ ও নোংরা লোকদের মধ্যেও কখনো এরূপ নিকৃষ্টতম চিন্তার উদ্রেক হয়নি। উমাইয়া খলীফা অলীদ ইবনে আবদুল মালেক (৮৬-

৯৭/৭০৫-৭১৬ খৃঃ) বলেন, কুরআনে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না থাকলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ নোংরা কাজ করতে পারে’।[3] তাদের এই দুষ্কর্মের বিষয়টি দু’টি কারণে ছিল তুলনাহীন। এক- এ কুকর্মের কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত ছিল না এবং একাজ সম্পূর্ণ নতুনভাবে তারা চালু করেছিল। দুই- এ কুকর্ম তারা প্রকাশ্য মজলিসে করত, যা ছিল বেহায়াপনার চূড়ান্ত রূপ।

বস্ত্ততঃ মানুষ যখন দেখে যে, সে কারু মুখাপেক্ষী নয়, তখন সে বেপরওয়া হয়’ (আলাক্ব ৯৬/৬-৭)। সাদূমবাসীদের জন্য আল্লাহ স্বীয় নে‘মত সমূহের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তার শুকরিয়া আদায় না করে কুফরী করে এবং ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম-প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যবোধটুকুও তারা হারিয়ে ফেলে। তারা এমন প্রকৃতি বিরুদ্ধ নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়, যা হারাম ও কবীরা গোনাহ তো বটেই, কুকুর-শূকরের মত নিকৃষ্ট জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। তারা এমন বদ্ধ নেশায় মত্ত হয় যে, লূত (আঃ)-এর উপদেশবাণী ও আল্লাহর গযবের ভীতি প্রদর্শন তাদের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করেনি। উল্টা তারা তাদের নবীকেই শহর থেকে বের করে দেবার হুমকি দেয় এবং বলে যে, ‘তোমার প্রতিশ্রুত আযাব এনে দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও’ (&আনকাবূত ২৯/২৯)। তখন লূত (আঃ) বিফল মনোরথ হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন। ফলে যথারীতি গযব নেমে এল। উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে মহামারী আকারে যে মরণ ব্যাধি এইড্সের বিস্তৃতি ঘটেছে, তার মূল কারণ হ’ল পুংমৈথুন, পায়ু মৈথুন ও সমকামিতা। ইসলামী শরী‘আতে এই কুকর্মের একমাত্র শাস্তি হ’ল উভয়ের মৃত্যুদন্ড (যদি উভয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে একাজ করে)।[4]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ملعونٌ منْ عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে লূতের কওমের মত কুকর্ম করে।[5] অন্যত্র তিনি বলেন, لاينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إلى رجلٍ أتى رجُلاً أو امرأةً فى دُبرها আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি ফিরে তাকাবেন না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষ বা নারীর মলদ্বারে মৈথুন করে’।[6] তিনি বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى عَمَلُ قَوْمِ لُوط আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে (ক্ষতিকর হিসাবে) ভয় পাই

লূত জাতির কুকর্মের’।[7] এইড্সের আতংকে ভয়ার্ত মানবজাতি শেষনবীর উক্ত বাণীগুলির প্রতি দৃষ্টি দিবে কি?

[3]. তাফসীরে ইবনে কাছীর, আ‘রাফ ৮০।

[4]. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, সনদ হাসান হা/৩৫৭৫ ‘দন্ডবিধি সমূহ’ অধ্যায়।

[5]. রাযীন, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩৫৮৩।

[6]. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৮৫।

[7]. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৭৭।

গযবের বিবরণ

আল্লাহর হুকুমে কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে প্রথমে হযরত ইবরাহীমের বাড়ীতে পদার্পণ করলেন। তিনি তাদেরকে মেহমানদারীর জন্য একটা আস্ত বাছুর গরু যবেহ করে ভুনা করে তাদের সামনে পরিবেশন করলেন। কিন্তু তারা তাতে হাত দিলেন না। এতে ইবরাহীম (আঃ) ভয় পেয়ে গেলেন (হূদ ১১/৬৯-৭০)। কেননা এটা ঐ সময়কার দস্যু-ডাকাতদেরই স্বভাব ছিল যে, তারা যে বাড়ীতে ডাকাতি করত বা যাকে খুন করতে চাইত, তার বাড়ীতে খেত না। ফেরেশতাগণ নবীকে অভয় দিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, ‘আমরা এসেছি অমুক শহরগুলি ধ্বংস করে দিতে। ইবরাহীম একথা শুনে তাদের সাথে ‘তর্ক জুড়ে দিলেন’ (হূদ ১১/৭৪) এবং বললেন, ‘সেখানে যে লূত আছে। তারা বললেন, সেখানে কারা আছে, আমরা তা ভালভাবেই জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব, তবে তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (আনকাবূত ২৯/৩১-৩২)। অতঃপর তারা ইবরাহীম দম্পতিকে ইসহাক-এর জন্মের সুসংবাদ শুনালেন।

বিবি সারা ছিলেন নিঃসন্তান। অতি বৃদ্ধ বয়সে এই সময় তাঁকে হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় ইসহাকের পরে তার ঔরসে যে ইয়াকূবের জন্ম হবে সেটাও জানিয়ে দেওয়া হ’ল (হূদ ১১/৭১-৭২)। উল্লেখ্য যে, ইয়াকূবের অপর নাম ছিল ‘ইস্রাঈল’ এবং তাঁর বংশধরগণকে বনু ইস্রাঈল বলা হয়। যে বংশে হাযার হাযার নবীর আগমন ঘটে।

কেন‘আনে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে বিদায় হয়ে ফেরেশতাগণ সাদূম নগরীতে ‘লূত (আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হ’লেন’ (হিজর ১৫/৬১)। এ সময় তাঁরা অনিন্দ্য সুন্দর নওজোয়ান রূপে আবির্ভূত হন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন, তখন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের পরীক্ষা নেন। সাদূম জাতি তাদের এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হ’ল। তারা যখন জানতে পারল যে, লূত-এর বাড়ীতে অতীব সুদর্শন কয়েকজন নওজোয়ান এসেছে, ‘তখন তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে সেদিকে ছুটে এল’ (হূদ ১১/৭৮)। এ দৃশ্য দেখে লূত (আঃ) তাদেরকে অনুরোধ করে বললেন, فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدٌ- ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অতিথিদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভাল মানুষ নেই’? (হূদ ১১/৭৮)। কিন্তু তারা কোন কথাই শুনলো না। তারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার উপক্রম করল। লূত (আঃ) বললেন, হায়! وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ- ‘আজকে আমার জন্য বড়ই সংকটময় দিন’ (হূদ ১১/৭৭)। তিনি বললেন, لَوْ أَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ- ‘হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন শক্তি থাকত, অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় পেতাম’ (হূদ ১১/৮০)। এবার ফেরেশতাগণ আত্মপরিচয় দিলেন এবং লূতকে অভয় দিয়ে বললেন, يَا لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا إِلَيْكَ ‘হে লূত! আমরা আপনার প্রভুর প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা কখনোই আপনার নিকটে পৌঁছতে পারবে না’ (হূদ ১১/৮১)।

এজন্যেই আমাদের রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ‘আল্লাহ রহম করুন লূতের উপরে, তিনি সুদৃঢ় আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন’ (অর্থাৎ আল্লাহর আশ্রয়)।[৪] অতঃপর জিবরীল তাদের দিকে পাখার ঝাপটা মারতেই বীর পুঙ্গরেরা সব অন্ধ হয়ে ভেগে গেল। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِيْ وَنُذُرِ، ‘ওরা লূতের কাছে তার মেহমানদের দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে দিলাম। অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও হুঁশিয়ারী’ (ক্বামার ৫৪/৩৭)।

অতঃপর ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আঃ)-কে স্বীয় পরিবারবর্গসহ (ক্বামার ৫৪/৩৪) ‘কিছু রাত থাকতেই’ এলাকা ত্যাগ করতে বললেন এবং বলে দিলেন যেন ‘কেউ পিছন ফিরে না দেখে। তবে আপনার বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত’। নিশ্চয়ই তার উপর ঐ গযব আপতিত

হবে, যা ওদের উপরে হবে। ভোর পর্যন্তই ওদের মেয়াদ। ভোর কি খুব নিকটে নয়’? (হূদ ১১/৮১; শো‘আরা ২৬/১৭১)। লূত (আঃ)-এর স্ত্রী ঈমান আনেননি এবং হয়তবা স্বামীর সঙ্গে রওয়ানাই হননি। তারা আরও বললেন, وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ- ‘আপনি তাদের পিছে অনুসরণ করুন। আর কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায়। আপনারা আপনাদের নির্দেশিত স্থানে চলে যান’ (হিজর ১৫/৬৫)। এখানে আল্লাহ লূতকে হিজরতকারী দলের পিছনে থাকতে বলা হয়েছে। বস্ততঃ এটাই হ’ল নেতার কর্তব্য।

অতঃপর আল্লাহর হুকুমে অতি প্রত্যুষে গযব কার্যকর হয়। লূত ও তাঁর সাথীগণ যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌছেন, তখন জিবরীল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্র ছুবহে ছাদিক-এর সময় একটি প্রচন্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলিকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং সাথে সাথে প্রবল বেগে ঘুর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيدٍ- (هود-৮২-৮৩)

‘অবশেষে যখন আমাদের হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমরা উক্ত জনপদের উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপরে ক্রমাগত ধারায় মেটেল প্রস্তর বর্ষণ করলাম’। ‘যার প্রতিটি তোমার প্রভুর নিকটে চিহ্নিত ছিল। আর ঐ ধ্বংসস্থলটি (বর্তমান আরবীয়) যালেমদের থেকে বেশী দূরে নয়’ (হূদ ১১/৮২-৮৩)।

এটা ছিল তাদের কুকর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল শাস্তি। কেননা তারা যেমন আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ বাদ দিয়ে মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে পুংমৈথুনে ও সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তাদেরকে মাটি উল্টিয়ে উপুড় করে শাস্তি দেওয়া হ’ল। ডঃ জামু বলেন, তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন আকারের এক হাযার উল্কাপিন্ড সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড়টির ওযন ছিল ৩৬ টন। এর মধ্যে অনেকগুলি আছে নুড়ি পাথর, যাতে গ্রানাইট ও কাঁচা অক্সাইড লৌহ মিশ্রিত। তাতে লাল বর্ণের চিহ্ন অংকিত ছিল এবং ছিল তীব্র মর্মভেদী। বিস্তর

গবেষণার পরে স্থির হয় যে, এগুলি সেই প্রস্তর, যা লূত জাতির উপরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল’ (সংক্ষেপায়িত)।[9] ইতিহাস-বিজ্ঞান বলে, সাদূম ও আমুরার উপরে গন্ধক (Sulpher)-এর আগুন বর্ষিত হয়েছিল।[10]

হযরত লূত (আঃ)-এর নাফরমান কওমের শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ، ‘(জনপদ উল্টানো ও প্রস্তর বর্ষণে নিশ্চিহ্ন ঐ ধ্বংসস্থলটি) বর্তমান কালের যালেমদের থেকে খুব বেশী দূরে নয়’ (হূদ ১১/৮৩)। মক্কার কাফেরদের জন্য উক্ত ঘটনাস্থল ও ঘটনার সময়কাল খুব বেশী দূরের ছিল না। মক্কা থেকে ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়া যাতায়াতের পথে সর্বদা সেগুলো তাদের চোখে পড়ত। কিন্তু তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতো না। বরং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অবিশ্বাস করত ও তাঁকে অমানুষিক কষ্ট দিত। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، رواه البيهقي-

‘যখন আমার উম্মত পাঁচটি বিষয়কে হালাল করে নেবে, তখন তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে। (১) যখন পরস্পরে অভিসম্পাৎ ব্যাপক হবে (২) যখন তারা মদ্যপান করবে (৩) রেশমের কাপড় পরিধান করবে (৪) গায়িকা-নর্তকী গ্রহণ করবে (৫) পুরুষ-পুরুষে ও নারী-নারীতে সমকামিতা করবে’।[11]

[8]. বুখারী হা/৩১৩৫; মুসলিম হা/২১৬; মিশকাত হা/৫৭০৫ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়, ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ।

[9]. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব পৃঃ ২৫৬।

[10]. স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃঃ ২৫৮।

[11]. বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, ত্বাবারানী, সনদ হাসান; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/২৩৮৬।

ধ্বংসস্থলের বিবরণ

কওমে লূত-এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে ‘বাহরে মাইয়েত’ বা ‘বাহরে লূত’ অর্থাৎ ‘মৃত সাগর’ বা ‘লূত সাগর’ নামে খ্যাত। যা ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল অঞ্চল জুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে।[12] যেটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বেশ নীচু। এর পানিতে তৈলজাতীয় পদার্থ বেশী। এতে কোন মাছ, ব্যাঙ এমনকি কোন জলজ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে ‘মৃত সাগর’ বা ‘মরু সাগর’ বলা হয়েছে। সাদূম উপসাগর বেষ্টক এলাকায় এক প্রকার অপরিচিত বৃক্ষ ও উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়, সেগুলো মাটির স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সেখানে শ্যামল-তাজা উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার ফল কাটলে তার মধ্যে পাওয়া যায় ধূলি-বালি ও ছাই। এখানকার মাটিতে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়। Natron ও পেট্রোল তো আছেই। এই গন্ধক উল্কা পতনের অকাট্য প্রমাণ।[13] আজকাল সেখানে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ হ’তে পর্যটকদের জন্য আশপাশে কিছু হোটেল-রেস্তোঁরা গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা থেকে শিক্ষা হাছিলের জন্য কুরআনী তথ্যাদি উপস্থাপন করে বিভিন্ন ভাষায় উক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে তা থেকে উপদেশ গ্রহণের জন্য পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হ’ত সবচাইতে যরূরী বিষয়। আজকের এইড্স আক্রান্ত বিশ্বের নাফরমান রাষ্ট্রনেতা, সমাজপতি ও বিলাসী ধনিক শ্রেণী তা থেকে শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হ’ত। কেননা এগুলি মূলতঃ মানুষের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ، ... إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

‘নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য’ ... এবং বিশ্বাসীদের জন্য’ (হিজর ১৫/৭৫, ৭৭)। একই ঘটনা বর্ণনা শেষে অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ- ‘জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমরা অত্র ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি’ (আনকাবূত ২৯/৩৫)।

[12]. সর্বশেষ হিসাব মতে উক্ত অঞ্চলটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৭৭ কিলোমিটার (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কিঃ মিঃ (প্রায় ৯ মাইল) এবং গভীরতায় ৪০০ মিটার (প্রায় কোয়ার্টার মাইল)। -ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব ২৮ এপ্রিল ২০০৯ পৃঃ ৮।
[13]. স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব, পৃঃ ২৫৮।

মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা

তখন উক্ত জনপদে লূত-এর পরিবারটি ব্যতীত মুসলমান ছিল না। আল্লাহ বলেন, فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ- 'আমরা সেখানে একটি বাড়ী ব্যতীত কোন মুসলমান পাইনি' (যারিয়াত ৫১/৩৬)। কুরআনী বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত গযব হ'তে মাত্র লূত-এর পরিবারটি নাজাত পেয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ব্যতীত' (আ'রাফ ৭/৮৩)। তাফসীরবিদগণ বলেন, লূত-এর পরিবারের মধ্যে কেবল তাঁর দু'মেয়ে মুসলমান হয়েছিল। তবে লূত-এর কওমের নেতারা লূত-কে সমাজ থেকে বের করে দেবার যে হুমকি দেয়, সেখানে তারা বহুবচন ব্যবহার করে বলেছিল أَخْرِجُوْهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُون. 'এদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দাও। কেননা এই লোকগুলি সর্বদা পবিত্র থাকতে চায়' (আ'রাফ ৭/৮২; নমল ২৭/৫৬)। এতদ্ব্যতীত শহর থেকে বের হবার সময় আল্লাহ লূতকে 'সবার পিছনে' থাকতে বলেন (হিজর ১৫/৬৫)। অন্যত্র বলা হয়েছে فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِين 'অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিবার সবাইকে নাজাত দিলাম' (শো'আরা ২৬/১৭০)। এখানে أجمعين বা 'সবাইকে' শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ঈমানদারগণের সংখ্যা বেশ কিছু ছিল। অতএব এখানে লূত-এর 'আহ্ল' (আ'রাফ ৮৩; হূদ ৮১; নমল ৫৭; ক্বামার ৩৪) বা পরিবার বলতে লূত-এর দাওয়াত কবুলকারী ঈমানদারগণকে সম্মিলিতভাবে 'আহলে ঈমান' বা 'একটি ঈমানদার পরিবার' গণ্য করা যেতে পারে। তবে প্রকৃত ঘটনা যেটাই হৌক না কেন, কেবলমাত্র নবীর অবাধ্যতা করলেই আল্লাহর গযব আসাটা অবশ্যম্ভাবী। তার উপরে কেউ ঈমান আনুক বা না আনুক। হাদীছে এসেছে, 'ক্বিয়ামতের দিন অনেক নবীর একজন উম্মতও থাকবে না'।[14] এখানে লক্ষণীয় যে, নবীপত্নী হয়েও লূতের স্ত্রী গযব থেকে রেহাই পাননি। আল্লাহ নূহ পত্নী ও লূত পত্নীকে ক্বিয়ামতের দিন বলবেন- وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِين، 'যাও জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও' (তাহরীম ৬৬/১০)।

[14]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৯৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. বান্দার প্রতিটি ভাল কিংবা মন্দ কর্ম আল্লাহর সরাসরি দৃষ্টিতে রয়েছে। বান্দার সৎকর্মে তিনি খুশী হন ও মন্দ কর্মে নাখোশ হন।

২. নবী কিংবা সংস্কারক পাঠিয়ে উপদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোন অবাধ্য কওমকে ধ্বংসকারী আযাবে গ্রেফতার করেন না।

৩. কওমের নেতারা ও ধনিক শ্রেণী প্রথমে পথভ্রষ্ট হয় ও সমাজকে বিপথে নিয়ে যায়। তারা সর্বদা পূর্বেকার রীতি-নীতির দোহাই দেয় এবং তাদের হঠকারিতা ও অহংকারী কার্যকলাপের ফলেই আল্লাহর চূড়ান্ত গযব নেমে আসে (ইসরা ১৭/১৬; যুখরুফ ৪৩/২৩)। অতএব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সর্বদা দূরদর্শী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা আবশ্যক।

৪. পুংমৈথুন বা পায়ুমৈথুন এমন একটি নিকৃষ্টতম স্বভাব, যা আল্লাহর ক্রোধকে ত্বরান্বিত করে। ব্যক্তিগত এই কুকর্ম কেবল ব্যক্তিকেই ধ্বংস করে না, তা সমাজকে বিধ্বস্ত করে। বর্তমান এইড্স আক্রান্ত বিশ্ব তার বাস্তব প্রমাণ।

৫. ঈমান না থাকলে কেবল বংশ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষকে আল্লাহর গযব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। যেমন লূত (আঃ)-এর স্ত্রী গযব থেকে রক্ষা পাননি।

হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)

আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِياً- وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا-

‘এই কিতাবে আপনি ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল ও নবী’। ‘তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে ছালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি স্বীয় পালনকর্তার নিকট পসন্দনীয় ছিলেন’ (মারিয়াম ১৯/৫৪-৫৫)।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। ঐ সময়ে ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর।[1] শিশু বয়সে তাঁকে ও তাঁর মাকে পিতা ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে মক্কার বিজন ভূমিতে রেখে আসেন। সেখানে ইবরাহীমের দো‘আর বরকতে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে যমযম কূপের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইয়ামনের ব্যবসায়ী কাফেলা বনু জুরহুম গোত্র কর্তৃক মা হাজেরার আবেদনক্রমে সেখানে আবাদী শুরু হয়। ১৪ বছর বয়সে আল্লাহর হুকুমে মক্কার অনতিদূরে মিনা প্রান্তরে সংঘটিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনা। পিতা ইবরাহীম কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে স্বহস্তে কুরবানীর উক্ত ঘটনায় শতবর্ষীয় পিতা ইবরাহীমের ভূমিকা যাই-ই থাকুক না কেন চৌদ্দ বছরের তরুণ ইসমাঈলের ঈমান ও আত্মত্যাগের একমাত্র নমুনা ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ না করলে পিতার পক্ষে পুত্র কুরবানীর ঘটনা সম্ভব হ’ত কি-না সন্দেহ। তাই ঐ সময় নবী না হ’লেও নবীপুত্র ইসমাঈলের আল্লাহভক্তি ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাঁর কথায় ও কর্মে। এরপর পিতার সহযোগী হিসাবে তিনি কা‘বা গৃহ নির্মাণে শরীক হন এবং কা‘বা নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, আল্লাহ পাক তা নিজ যবানীতে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন (বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৯)।

এভাবে ইসমাঈল স্বীয় পিতার ন্যায় বিশ্বের তাবৎ মুমিন হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রশংসায় সূরা মারিয়াম ৫৪ আয়াতে বলেন, তিনি ছিলেন ওয়াদা রক্ষায় সত্যাশ্রয়ী’ যা তিনি যবহের পূর্বে পিতাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন,

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِين، ‘হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন’ (ছাফফাত ৩৭/১০২)।

অতঃপর কা‘বা নির্মাণকালে পিতা-পুত্রের দো‘আর (বাক্বারাহ ১২৭-২৯) বরকতে প্রথমতঃ কা‘বা গৃহে যেমন হাযার হাযার বছর ধরে চলছে তাওয়াফ ও ছালাত এবং হজ্জ ও ওমরাহর ইবাদত, তেমনি চলছে ঈমানদার মানুষের ঢল। দ্বিতীয়তঃ সেখানে সারা পৃথিবী থেকে সর্বদা আমদানী হচ্ছে ফল-ফলাদীর বিপুল সম্ভার। তাঁদের দো‘আর তৃতীয় অংশ মক্কার জনপদে নবী প্রেরণের বিষয়টি বাস্তবায়িত হয় তাঁদের মৃত্যুর প্রায় আড়াই হাযার বছর পরে ইসমাঈলের বংশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। ইসমাঈল (আঃ) মক্কায় আবাদকারী ইয়ামনের বনু জুরহুম গোত্রে বিবাহ করেন। তাদেরই একটি শাখা গোত্র কুরায়েশ বংশ কা‘বা গৃহ তত্ত্বাবধানের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। এই মহান বংশেই শেষনবীর আগমন ঘটে।

উল্লেখ্য যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ৯টি সূরায় ২৫টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[2]

[1]. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৭৯ পৃঃ।

[2]. যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/১২৫, ১২৭-১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০=৮; আলে ইমরান ৩/৮৪; নিসা ৪/১৬৩; আন‘আম ৬/৮৬; ইবরাহীম ১৪/৩৯; মারিয়াম ১৯/৫৪-৫৫; আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬; ছাফফাত ৩৭/১০১-১০৮=৮; ছোয়াদ ৩৮/৪৮। সর্বমোট =২৫ টি

পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দৃষ্টান্ত

তিনি পিতার প্রতি কেমন শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত ছিলেন, তা নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়। হাজেরার মৃত্যুর পর ইবরাহীম (আঃ) যখন ইসমাঈলকে দেখতে যান, তখন তার স্ত্রীকে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘আমরা খুব অভাবে ও কষ্টের মধ্যে আছি’। জবাবে তিনি বলেন, তোমার স্বামী এলে তাকে আমার সালাম দিয়ে বলো যে, তিনি যেন দরজার চৌকাঠ পাল্টে ফেলেন’। পরে ইসমাঈল বাড়ী ফিরলে ঘটনা শুনে বলেন, উনি আমার আববা এবং তিনি তোমাকে তালাক দিতে বলেছেন। ফলে ইসমাঈল স্ত্রীকে তালাক দেন ও অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন। পরে একদিন পিতা এসে একই প্রশ্ন করলে স্ত্রী বলেন, আমরা ভাল ও সচ্ছলতার মধ্যে আছি এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন। ইবরাহীম তাদের সংসারে বরকতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। অতঃপর

তাকে বলেন, তোমার স্বামী ফিরলে তাকে বলো যেন দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখেন ও মযবূত করেন’। ইসমাঈল ফিরে এলে ঘটনা শুনে তার ব্যাখ্যা দেন ও বলেন, উনি আমার পিতা। তোমাকে স্ত্রীত্বে বহাল রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এই ঘটনার কিছু দিন পর ইবরাহীম পুনরায় আসেন। অতঃপর পিতা-পুত্র মিলে কা‘বা গৃহ নির্মাণ করেন।[3]

[3]. বুখারী ইবনু আববাস হ’তে হা/৩৩৬৪ ‘নবীগণের কাহিনী’ অধ্যায়।

প্রথম বিশুদ্ধ আরবী ভাষী

ইসমাঈল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَوَّلُ مَنْ فَتَقَ لِسَانَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ الْبَيِّنَةِ إِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً-

‘সর্বপ্রথম ‘স্পষ্ট আরবী’ ভাষা ব্যক্ত করেন ইসমাঈল। যখন তিনি ছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সের তরুণ’।[4] এখানে ‘স্পষ্ট আরবী’ অর্থ ‘বিশুদ্ধ আরবী ভাষা’ (العربية الفصيحة البليغة) এটাই ছিল কুরায়শী ভাষা (لغة قريش), যে ভাষায় পরে কুরআন নাযিল হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সকল ভাষাই আল্লাহ কর্তৃক ইলহামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। ইসমাঈল ছিলেন বিশুদ্ধ কুরায়শী আরবী ভাষার প্রথম ইলহাম প্রাপ্ত মনীষী। এটি ইসমাঈলের জন্য একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। এজন্য তিনি ছিলেন ‘আবুল আরব’ (أبو العرب) বা আরবদের পিতা।

অন্যান্য নবীগণের ন্যায় যদি ইসমাঈল ৪০ বছর বয়সে নবুঅত পেয়ে থাকেন, তাহ’লে বলা চলে যে, ইসমাঈলের নবুঅতী মিশন আমৃত্যু মক্কা কেন্দ্রিক ছিল। তিনি বনু জুরহুম গোত্রে তাওহীদের দাওয়াত দেন। ইস্রাঈলী বর্ণনানুসারে তিনি ১৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ও মা হাজেরার পাশে কবরস্থ হন’।[5] কা‘বা চত্বরে রুকনে ইয়ামানীর মধ্যে তাঁর কবর হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। তবে মক্কাতেই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, এটা নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায়।

ইসমাঈলের বড় মহত্ত্ব এই যে, তিনি ছিলেন ‘যবীহুল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহর রাহে স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গকারী এবং তিনি হ’লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মহান পূর্বপুরুষ।

আল্লাহ তাঁর উপরে শান্তি বর্ষণ করুন। তাঁর সম্পর্কে ইবরাহীমের জীবনীতে আলোচিত হয়েছে।

[4]. ত্বাবারানী, আওয়ায়েল; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৩৪৬; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮০।

[5]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৮০।

যবীহুল্লাহ কে?

উক্ত বিষয়ে মূলত: কোন মতভেদ নেই। কেননা মুসলিম ও আহলে কিতাব প্রায় সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত যে, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। কেননা তিনিই ইবরাহীমের প্রথম পুত্র এবং হাজেরার গর্ভে জন্ম। তিনি মক্কাতেই বড় হন। সেখানেই বসবাস করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কুরবানীর মহান ঘটনা মক্কাতেই ঘটে। তিনি কখনোই কেন‘আনে আসেননি। পিতা ইবরাহীম তাকে নিয়ে মক্কায় কা‘বা গৃহ নির্মাণ করেন।

পক্ষান্তরে ইসহাকের জন্ম হয় কেন‘আনে বিবি সারাহর গর্ভে ইসমাঈলের প্রায় চৌদ্দ বছর পরে। শৈশবে তিনি মক্কায় এসেছেন বলে জানা যায় না। পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারায় ১৩৩,৩৬, ৪০; সূরা আলে ইমরান ৮৪, নিসা ১৬৩, ইবরাহীম ৩৯, ছাফফাত ১০০-১১৩ আয়াতগুলিতে সর্বত্র ইসমাঈলের পরেই ইসহাক ও ইয়াকূবের আলোচনা এসেছে। এব্যাপারে সকল ইস্রাঈলী বর্ণনা একমত যে, ইসমাঈলের জন্মের সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল ৮৬ বছর। পক্ষান্তরে ইসহাক জন্মের সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল অন্যূন ১০০ বছর এবং সারাহর বয়স ছিল অন্যূন ৯০ বছর।

নিঃসন্তান ইবরাহীম বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর নিকট একটি ‘নেককার সন্তান’ প্রার্থনা করেছিলেন। যেমন رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيم ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান কর।’ ‘অতঃপর আমরা তাকে একটি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।’ (ছাফফাত ৩৭/১০০-০১)। আর তিনিই ছিলেন প্রথম সন্তান ইসমাঈল। অতঃপর ইসমাঈলের কুরবানীর ঘটনা শেষে যখন ইবরাহীম কেন‘আনে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন সেখানে ফেরেশতাদের আগমন ঘটে। যারা লূত-এর কওমকে ধ্বংস করতে যাওয়ার পথে তাঁর বাড়ীতে যাত্রা বিরতি করেন

এবং সারাহর গর্ভে ইসহাক জন্মের ও তার ঔরসে পরবর্তীতে ইয়াকূব জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেন (হূদ ১১/৭১)। সূরা ছাফফাত ১০১ আয়াতে ইবরাহীমকে একটি ধৈর্য্যশীল সন্তানের সুসংবাদ শুনানোর পরে কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা শেষে ১১২ আয়াতে বলা হয়েছে وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِين ‘অতঃপর আমরা তাকে ইসহাক জন্মের সুসংবাদ দিলাম যিনি নবী হবেন ও সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন’ (ছাফফাত ৩৭/১১২)। উক্ত আয়াতগুলির বর্ণনা পরম্পরায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রথম সুসংবাদ প্রাপ্ত সন্তানটি ছিলেন ইসমাঈল, যাকে কুরবানী করা হয়। অতঃপর সুসংবাদ প্রাপ্ত সন্তান ছিলেন ইসহাক। যেমন ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দো‘আ করেন الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاء- ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দান করেছেন ইসমাঈল ও ইসহাককে। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অবশ্যই দো‘আ কবুলকারী’ (ইবরাহীম ১৪/৩৯)। এখানে তিনি ইসমাঈলের পরে ইসহাকের নাম উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন ইবরাহীমের প্রথম সন্তান ইসমাঈল।

এক্ষণে পূর্বের ও পরের যে সকল বিদ্বান ইসহাককে যবীহুল্লাহ বলেছেন, তারা মূলতঃ ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের উপর নির্ভর করেছেন। যার প্রায় সবগুলিই কা‘ব আল-আহবারের বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। এই ইহুদী পন্ডিত হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাওরাত বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাত এই ব্যক্তি নানা বিকৃত বর্ণনা পরিবেশন করেন।

এটা ছিল আরবদের প্রতি ইহুদীদের চিরন্তন বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা ইসমাঈল ছিলেন আরব জাতির পিতা। যিনি হেজাযে বসবাস করতেন। আর তার বংশেই এসেছিলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। পক্ষান্তরে ইসহাক ছিলেন ইয়াকূবের পিতা। যিনি কেন‘আনে বসাবস করতেন। আর ইয়াকূবের অপর নাম ছিল ইস্রাঈল। যার দিকেই বনু ইস্রাঈলকে সম্বন্ধ করা হয়। ফলে হিংসুক ইস্রাঈলীরা আরবদের সম্মান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করতে চেয়েছে এবং ইসমাঈলের বদলে ইসহাকের নাম যবীহুল্লাহ বলে প্রচার করেছে। যা স্রেফ মিথ্যা ও অপবাদ মাত্র।[6]

[6]. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা ছাফফাত ১০০-১১৩।

হযরত মূসা ও হারূণ (আলাইহিমাস সালাম)

আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর আদি ৬টি জাতির মধ্যে কওমে নূহ, ‘আদ, ছামূদ, লূত্ব ও কওমে মাদইয়ানের বর্ণনার পর ষষ্ঠ গযবপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে কওমে ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।[1] কুরআনে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হ’ল এটি। যাতে ফেরাঊনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ও তার যুলুমের নীতি-পদ্ধতি সমূহ পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং এযুগের ফেরাঊনদের বিষয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী হুঁশিয়ার হয়। ফেরাঊনের কাছে প্রেরিত নবী মূসা ও হারূণ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনে সর্বাধিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ মূসা (আঃ)-এর মু‘জেযা সমূহ অন্যান্য নবীদের তুলনায় যেমন বেশী ছিল, তাঁর সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলের মূর্খতা ও হঠকারিতার ঘটনাবলীও ছিল বিগত উম্মতগুলির তুলনায় অধিক এবং চমকপ্রদ। এতদ্ব্যতীত মূসা (আঃ)-কে বারবার পরীক্ষা নেবার মধ্যে এবং তাঁর কওমের দীর্ঘ কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও আদেশ-নিষেধের কথাও এসেছে। সর্বোপরি শাসক সম্রাট ফেরাঊন ও তার ক্বিবতী সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘু অভিবাসী বনু ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের উপর যুলুম-অত্যাচারের বিবরণ ও তার প্রতিরোধে মূসা (আঃ)-এর প্রচেষ্টা এবং দীর্ঘ বিশ বছর ধরে যালেম সম্প্রদায়ের উপরে আপতিত বিভিন্ন গযবের বর্ণনা ও অবশেষে ফেরাঊনের সদলবলে সলিল সমাধির ঘটনা যেন জীবন্ত বাণীচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত কুরআনের অনুপম বাকভঙ্গীতে। মোটকথা কুরআন পাক মূসা (আঃ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু বর্ণিত হয়েছে। কারণ এই কাহিনীতে অগণিত শিক্ষা, আল্লাহ তা‘আলার অপার শক্তি ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর রহস্য সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশিকা সমূহ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

ফেরাঊনের পরিচয়

‘ফেরাঊন’ কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি হ’ল তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। ক্বিবতী বংশীয় এই সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী মিসর শাসন করেন। এই সময় মিসর সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। লাশ মমিকরণ, পিরামিড (PYRAMID), স্ফিংক্স (SPHINX) প্রভৃতি তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়ে পরপর দু’জন ফেরাঊন ছিলেন। সর্বসম্মত

ইস্রাঈলী বর্ণনাও হ’ল এটাই এবং মূসা (আঃ) দু’জনেরই সাক্ষাৎ লাভ করেন। লুইস গোল্ডিং (LOUIS GOLDING)-এর তথ্যানুসন্ধানমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER অনুযায়ী উক্ত ‘উৎপীড়ক ফেরাঊন’-এর (PHARAOH, THE PERSECUTOR) নাম ছিল ‘রেমেসিস-২’ (RAMSES-11) এবং ডুবে মরা ফেরাঊন ছিল তার পুত্র মানেপতাহ (منفطه) বা মারনেপতাহ (MERNEPTAH)। লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হরদে তিনি সসৈন্

যে ডুবে মরেন। যার ‘মমি’ ১৯০৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে ‘জাবালে ফেরাঊন’ নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই ফেরাঊনের লাশ প্রথম পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। গোল্ডিংয়ের ভ্রমণ পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, ‘থেব্স’ (THEBES) নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়, যাতে মারনেপতাহ-এর আমলের কীর্তি সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ১৯০৬ সালে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ (SIR CRAFTON ELLIOT SMITH) মমিগুলো খুলে মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান শুরু করেন। এভাবে তিনি 44টি মমি পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৯০৭ সালে তিনি ফেরাঊন মারনেপতাহ-এর লাশ শনাক্ত করেন। ঐসময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। এ কারণে যে, অন্য কোন মমি দেহে অনুরূপ পাওয়া যায়নি।[3] উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য। এভাবে সূরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়। যেখানে আল্লাহ বলেছিলেন যে, ‘আজকে আমরা তোমার দেহকে (বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম। যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হ’তে পার’... (ইউনুস ১০/৯২)। বস্তুতঃ ফেরাঊনের লাশ আজও মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে। যা দেখে লোকেরা উপদেশ হাছিল করতে পারে।

মূসা ও ফেরাঊন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ- إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ- (القصص-৩-8)

'আমরা আপনার নিকটে মূসা ও ফেরাঊনের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে সত্য সহকারে বর্ণনা করব বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'। 'নিশ্চয়ই ফেরাঊন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যকার একটি দলকে সে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। বস্ত্ততঃ সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত' (ক্বাছাছ ২৮/৩-৪)।

পবিত্র কুরআনে ফেরাঊনের আলোচনা যত এসেছে, পূর্ব যুগের অন্য কোন নরপতি সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা আসেনি। এর মাধ্যমে ফেরাঊনী যুলুমের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যাতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, যুগে যুগে ফেরাঊনরা আসবে এবং ঈমানদার সৎকর্মশীলদের উপরে তাদের যুলুমের ধারা ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রূপ হবে। যদিও পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে। কোন যুগই ফেরাঊন থেকে খালি থাকবে না। তাই ফেরাঊন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই নরাধম সম্পর্কে এত বেশী আলোচনা করেছেন। যাতে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সাবধান হয় এবং যালেমদের ভয়ে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। মুসলিম নামধারী বর্তমান মিসরীয় জাতীয়তাবাদী নেতারা ফেরাঊনকে তাদের 'জাতীয় বীর' বলে আখ্যায়িত করছেন এবং কায়রোর 'ময়দানে রেমেসীস'-এর প্রধান ফটকে তার বিশাল প্রস্তর মূর্তি খাড়া করেছেন'।[4]

[3]. মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকা: ১৯৯৬) ৫/৯৯ পৃ:; তানত্বাভী জওহারী (মৃ: ১৯৪০খৃ:), আল-জাওয়াহের ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি) তাফসীর সূরা ইউনুস ৯২ দ্র: ৬/৮৪ পৃ:।
[4]. মুহাম্মাদ সালামাহ জাবর, তারীখুল আম্বিয়া (কুয়েত: মাকতাবা ছাহওয়াহ ১৪১৩/১৯৯৩) ১/১৩৭।

বনু ইস্রাঈলের পূর্ব ইতিহাস

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত ইসহাক্ব (আঃ)-এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল'। হিব্রু ভাষায় 'ইস্রাঈল' অর্থ 'আল্লাহর দাস'। সে হিসাবে ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধরগণকে 'বনু ইস্রাঈল' বলা হয়। কুরআনে তাদেরকে 'বনু ইস্রাঈল' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যাতে 'আল্লাহর দাস' হবার কথাটি তাদের বারবার স্মরণে আসে।

ফেরাঊন ছিল মিসরের ক্বিবতী বংশীয় শাসকদের উপাধি। ক্বিবতীরা ছিল মিসরের আদি বাসিন্দা। এক্ষণে তারা সম্রাট বংশের হওয়ায় শাম থেকে আগত সুখী-স্বচ্ছল বনু ইস্রাঈলদের হিংসা করতে থাকে। ক্রমে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের রূপ পরিগ্রহ করে।

মূসা (আঃ)-এর পরিচয়

موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام-

মূসা ইবনে ইমরান বিন ক্বাহেছ বিন 'আযের বিন লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)।[8] অর্থাৎ মূসা হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ। মূসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল 'ইমরান' ও মাতার নাম ছিল 'ইউহানিব'। তবে মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে।[9] উল্লেখ্য যে, মারিয়াম (আঃ)-এর পিতার নামও ছিল 'ইমরান'। যিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নানা। মূসা ও ঈসা উভয় নবীই ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশীয় এবং উভয়ে বনু ইস্রাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন (সাজদাহ ৩২/২৩, ছফ ৬১/৬)। মূসার জন্ম হয় মিসরে এবং লালিত-পালিত হন মিসর সম্রাট ফেরাঊনের ঘরে। তাঁর সহোদর ভাই হারূণ (আঃ) ছিলেন তাঁর চেয়ে তিন বছরের বড় এবং তিনি মূসা (আঃ)-এর তিন বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের মৃত্যু হয় মিসর ও শাম-এর মধ্যবর্তী তীহ্ প্রান্তরে বনু ইস্রাঈলের ৪০ বছর আটক থাকাকালীন সময়ে। মাওলানা মওদূদী বলেন, মূসা (আঃ) পঞ্চাশ বছর বয়সে নবী হয়ে ফেরাঊনের দরবারে পৌঁছেন। অতঃপর তেইশ বছর দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পর ফেরাঊন ডুবে মরে এবং বনু ইস্রাঈল মিসর থেকে বেরিয়ে যায়। এ সময় মূসা (আঃ)-এর বয়স ছিল সম্ভবতঃ আশি বছর।[10] তবে মুফতী মুহাম্মাদ শফী বলেন, ফেরাঊনের জাদুকরদের সাথে মুকাবিলার ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী মূসা (আঃ) বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করেন। এ সময় আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে নয়টি মু'জেযা দান করেন।

উল্লেখ্য যে, আদম, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) ব্যতীত প্রায় সকল নবীই চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন। মূসাও চল্লিশ বছর বয়সে নবুঅত লাভ করেছিলেন বলে অধিকাংশ বিদ্বান মত পোষণ করেছেন।[11] সেমতে আমরা মূসা (আঃ)-এর

বয়সকে নিম্নরূপে ভাগ করতে পারি। যেমন, প্রথম ৩০ বছর মিসরে, তারপর ১০ বছর মাদিয়ানে, তারপর মিসরে ফেরার পথে তূর পাহাড়ের নিকটে ‘তুবা’ (طُوًى) উপত্যকায় ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ। অতঃপর ২০ বছর মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান। তারপর ৬০ বছর বয়সে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে মিসর হ’তে প্রস্থান এবং ফেরাঊনের সলিল সমাধি। অতঃপর আদি বাসস্থান কেন‘আন অধিকারী আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম অমান্য করায় অবাধ্য ইস্রাঈলীদের নিয়ে ৪০ বছর যাবতীহ্ প্রান্তরে উন্মুক্ত কারাগারে অবস্থান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়সের মধ্যে। মূসা (আঃ)-এর কবর হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। আমাদের নবী (ছাঃ) সেখানে একটি লাল ঢিবির দিকে ইশারা করে সেস্থানেই মূসা (আঃ)-এর কবর হয়েছে বলে জানিয়েছেন।[12] উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ) থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১০/১২ জন নবী বাদে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে আগত সর্বমোট এক লক্ষ চবিবশ হাযার নবী-রাসূলের[13] প্রায় সবাই ইস্রাঈল বংশের ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন সেমেটিক। কেননা ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন সাম বিন নূহ-এর ৯ম অধঃস্তন পুরুষ। এজন্য ইবরাহীমকে ‘আবুল আম্বিয়া’ বা নবীদের পিতা বলা হয়।

[8]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২২।

[9]. তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন, ত্বোয়াহা ৩৮-৩৯, পৃঃ ৮৫১।

[10]. রাসায়েল ও মাসায়েল ৩/১২০, ৩য় মুদ্রণ ২০০১।

[11]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৬।

[12]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ।

[13]. আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায় ৯ অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।

মূসা ও ফেরাঊনের কাহিনী

সুদ্দী ও মুররাহ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) এবং বহু সংখ্যক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, ফেরাঊন একদা স্বপ্নে দেখেন যে, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিক হ’তে একটি আগুন এসে মিসরের ঘর-বাড়ি ও মূল অধিবাসী ক্বিবতীদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অথচ অভিবাসী বনু ইস্রাঈলদের কিছুই হচ্ছে না। ভীত-

চকিত অবস্থায় তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। অতঃপর দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করলেন এবং তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা দিলেন ও এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। জ্যোতিষীগণ বলল যে, অতি সত্বর বনু ইস্রাঈলের মধ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যার হাতে মিসরীয়দের ধ্বংস নেমে আসবে’।[14]

মূসা নদীতে নিক্ষিপ্ত হ’লেন

ফেরাঊনের সৈন্যদের হাতে নিহত হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিলে আল্লাহর প্রত্যাদেশ (ইলহাম) অনুযায়ী পিতা-মাতা তাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে সিন্দুকে ভরে বাড়ীর পাশের নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন।[17] অতঃপর স্রোতের সাথে সাথে সিন্দুকটি এগিয়ে চলল। ওদিকে মূসার (বড়) বোন তার মায়ের হুকুমে (ক্বাছাছ ২৮/১১) সিন্দুকটিকে অনুসরণ করে নদীর কিনারা দিয়ে

চলতে লাগল (ত্বোয়াহা ২০/৪০)। এক সময় তা ফেরাঊনের প্রাসাদের ঘাটে এসে ভিড়ল। ফেরাঊনের পুণ্যবতী স্ত্রী আসিয়া (آسِيَة) বিনতে মুযাহিম ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটিকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফেরাঊন তাকে বনু ইস্রাঈল সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু সন্তানহীনা স্ত্রীর অপত্য স্নেহের কারণে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ফেরাঊন নিজে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কারণ আল্লাহ মূসার চেহারার মধ্যে বিশেষ একটা মায়াময় কমনীয়তা দান করেছিলেন (ত্বোয়াহা ২০/৩৯)। যাকে দেখলেই মায়া পড়ে যেত। ফেরাঊনের হৃদয়ের পাষাণ গলতে সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। বস্ত্ততঃ এটাও ছিল আল্লাহর মহা পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। ফুটফুটে শিশুটিকে দেখে ফেরাঊনের স্ত্রী তার স্বামীকে বললেন,

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ- (القصص-৯)

‘এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি। একে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি’। আল্লাহ বলেন, ‘অথচ তারা (আমার কৌশল) বুঝতে পারল না’ (ক্বাছাছ ২৮/৯)। মূসা এক্ষণে ফেরাঊনের স্ত্রীর কোলে পুত্রস্নেহ পেতে শুরু করলেন। অতঃপর বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য রাণীর

নির্দেশে বাজারে বহু ধাত্রীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ’ল। কিন্তু মূসা কারুরই বুকে মুখ দিচ্ছেন না। আল্লাহ বলেন, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ- (القصص ১২)- ‘আমরা পূর্ব থেকেই অন্যের দুধ খাওয়া থেকে মূসাকে বিরত রেখেছিলাম’ (ক্বাছাছ ২৮/১২)। এমন সময় অপেক্ষারত মূসার ভগিনী বলল, ‘আমি কি আপনাদেরকে এমন এক পরিবারের খবর দিব, যারা আপনাদের জন্য এ শিশু পুত্রের লালন-পালন করবে এবং তারা এর শুভাকাংখী’? (ক্বাছাছ ২৮/১২)। রাণীর সম্মতিক্রমে মূসাকে প্রস্তাবিত ধাত্রীগৃহে প্রেরণ করা হ’ল। মূসা খুশী মনে মায়ের দুধ গ্রহণ করলেন। অতঃপর মায়ের কাছে রাজকীয় ভাতা ও উপঢৌকনাদি প্রেরিত হ’তে থাকল।[18] এভাবে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে মূসা তার মায়ের কোলে ফিরে এলেন। এভাবে একদিকে পুত্র হত্যার ভয়ংকর আতংক হ’তে মা-বাবা মুক্তি পেলেন ও নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া সন্তানকে পুনরায় বুকে ফিরে পেয়ে তাদের হৃদয় শীতল হ’ল। অন্যদিকে বহু মূল্যের রাজকীয় ভাতা পেয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহের দুশ্চিন্তা হ’তে তারা মুক্ত হ’লেন। সাথে সাথে সম্রাট নিয়োজিত ধাত্রী হিসাবে ও সম্রাট পরিবারের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাঁদের পরিবারের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেল। এভাবেই ফেরাঊনী কৌশলের উপরে আল্লাহর কৌশল বিজয়ী হ’ল। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

আল্লাহ বলেন, وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ- (النمل ৫০)- ‘তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও কৌশল করেছিলাম। কিন্তু তারা (আমাদের কৌশল) বুঝতে পারেনি’ (নমল ২৭/৫০)।

[17]. তাফসীর ইবনু কাছীর, ক্বাছাছ ৭ আয়াত।
[18]. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১/২২৫; ঐ, তাফসীর সূরা ত্বোয়াহা ৪০ আয়াত, নাসাঈ, ‘হাদীছুল ফুতূন’।

যৌবনে মূসা

দুগ্ধ পানের মেয়াদ শেষে মূসা অতঃপর ফেরাঊন-পুত্র হিসাবে তার গৃহে শান-শওকতের মধ্যে বড় হ’তে থাকেন। আল্লাহর রহমতে ফেরাঊনের স্ত্রীর অপত্য স্নেহ ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় দুনিয়াবী রক্ষাকবচ। এভাবে وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ- (القصص ১৪)- ‘যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং

পূর্ণবয়স্ক মানুষে পরিণত হ’লেন, তখন আল্লাহ তাকে বিশেষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান সম্পদে ভূষিত করলেন’ (ক্বাছাছ ২৮/১৪)।

মূসা সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। দেখলেন যে, পুরা মিসরীয় সমাজ ফেরাঊনের একচ্ছত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে কঠোরভাবে শাসিত। ‘বিভক্ত কর ও শাসন কর’ এই সুপরিচিত ঘৃণ্য নীতির অনুসরণে ফেরাঊন তার দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল ও একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল (ক্বাছাছ ২৮/৪)। আর সেটি হ’ল বনু ইস্রাঈল। প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মাবার ভয়ে সে তাদের নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। এভাবে একদিকে ফেরাঊন অহংকারে স্ফীত হয়ে নিজেকে ‘সর্বোচ্চ পালনকর্তা ও সর্বাধিপতি’ ভেবে সারা দেশে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এমনকি সে নিজেকে ‘একমাত্র উপাস্য’ (القصص -مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِىْ- ৩৮)- (ক্বাছাছ ২৮/৩৮) বলতেও লজ্জাবোধ করেনি।

মূসার পরীক্ষা সমূহ

অন্যান্য নবীদের পরীক্ষা হয়েছে সাধারণতঃ নবুঅত লাভের পরে। কিন্তু মূসার পরীক্ষা শুরু হয়েছে তার জন্ম লাভের পর থেকেই। বস্ততঃ নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে তাঁর জীবনে বহু পরীক্ষা হয়েছে। যেমন আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে শুনিয়ে বলেন, وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا ‘আর আমরা তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি’ (ত্বোয়াহা ২০/৪০)।

নবুঅত লাভের পূর্বে তাঁর প্রধান পরীক্ষা ছিল তিনটি। যথাঃ (১) হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া (২) মাদিয়ানে হিজরত (৩) মাদিয়ান থেকে মিসর যাত্রা।

অতঃপর নবুঅত লাভের পর তাঁর পরীক্ষা হয় প্রধানতঃ চারটিঃ (১) জাদুকরদের মুকাবিলা (২) ফেরাঊনের যুলুমসমূহ মুকাবিলা (৩) সাগরডুবির পরীক্ষা (৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস অভিযান।

মাদিয়ানের জীবন : বিবাহ ও সংসার পালন মাদিয়ানে প্রবেশ করে তিনি পানির আশায় একটা কূপের দিকে গেলেন। সেখানে পানি প্রার্থী লোকদের ভিড়ের অদূরে দু’টি

মেয়েকে তাদের তৃষ্ণার্ত পশুগুলি সহ অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর হৃদয় উথলে উঠলো। কেউ তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপই করছে না। মূসা নিজে মযলূম। তিনি মযলূমের ব্যথা বুঝেন। তাই কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে মেয়ে দু'টির দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাদের সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, 'আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়ে চলে যায়। অথচ আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ' (যিনি ঘরে বসে আমাদের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছেন)। 'অতঃপর তাদের পশুগুলি এনে মূসা পানি পান করালেন' (তারপর মেয়ে দু'টি পশুগুলি নিয়ে বাড়ী চলে গেল)। মূসা একটি গাছের ছায়ায় বসে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন,

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ- (القصص-২৪)

'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার উপর যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী' (ক্বাছাছ ২৮/২৪)। হঠাৎ দেখা গেল যে 'বালিকাদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তাঁর দিকে আসছে'। মেয়েটি এসে ধীর কণ্ঠে তাকে বলল, 'আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে পুরস্কার দিতে পারেন' (ক্বাছাছ ২৮/২৩-২৫)।

উল্লেখ্য যে, বালিকাদ্বয়ের পিতা ছিলেন মাদইয়ান বাসীদের নিকটে প্রেরিত বিখ্যাত নবী হযরত শু'আয়েব (আঃ)। মূসা ইতিপূর্বে কখনো তাঁর নাম শোনেননি বা তাঁকে চিনতেন না। তাঁর কাছে পৌঁছে মূসা তাঁর বৃত্তান্ত সব বর্ণনা করলেন। শু'আয়েব (আঃ) সবকিছু শুনে বললেন, لاَتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، 'ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছ'। 'এমন সময় বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, আববা! এঁকে বাড়ীতে কর্মচারী হিসাবে রেখে দিন। কেননা إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ আপনার কর্ম সহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' (ক্বাছাছ ২৮/২৬)। 'তখন তিনি মূসাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার বাড়ীতে কর্মচারী থাকবে। তবে যদি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসাবে

পাবে’। ‘মূসা বলল, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হ’ল। দু’টি মেয়াদের মধ্য থেকে যেকোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপরে তত্ত্বাবধায়ক’ (ক্বাছাছ ২৮/২৫-২৮)। মূলতঃ এটাই ছিল তাদের বিয়ের মোহরানা। সেযুগে এ ধরনের রেওয়াজ অনেকের মধ্যে চালু ছিল। যেমন ইতিপূর্বে ইয়াকূব (আঃ) তাঁর স্ত্রীর মোহরানা বাবদ সাত বছর শ্বশুর বাড়ীতে মেষ চরিয়েছেন। এভাবে অচেনা-অজানা দেশে এসে মূসা (আঃ) অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এবং অন্যান্য নিরাপত্তাসহ অত্যন্ত মর্যাদাবান ও নির্ভরযোগ্য একজন অভিভাবক পেয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে পেলেন জীবন সাথী একজন পতি-পরায়ণা বুদ্ধিমতী স্ত্রী। অতঃপর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে মূসার দিনগুলি অতিবাহিত হ’তে থাকলো। সময় গড়িয়ে এক সময় মেয়াদ পূর্ণ হ’য়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, তিনি চাকুরীর বাধ্যতামূলক আট বছর এবং ঐচ্ছিক দু’বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। কেননা এটাই নবী চরিত্রের জন্য শোভনীয় যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঐচ্ছিক দু’বছরও তিনি পূর্ণ করবেন’।[19]

পরিবারের কাফেলা নিয়ে মূসা রওয়ানা হ’লেন স্বদেশ অভিমুখে। পথিমধ্যে মিসর সীমান্তে অবস্থিত সিনাই পর্বতমালার তূর পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলে হঠাৎ স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হ’ল। এখুনি প্রয়োজন আগুনের। কিন্তু কোথায় পাবেন আগুন। পাথরে পাথরে ঘষে বৃথা চেষ্টা করলেন কতক্ষণ। প্রচন্ড শীতে ও তুষারপাতের কারণে পাথর ঘষায় কাজ হ’ল না। দিশেহারা হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ অনতিদূরে আগুনের হলকা নজরে পড়ল। আশায় বুক বাঁধলেন। স্ত্রী ও পরিবারকে বললেন, ‘তোমরা এখানে অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা সেখানে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব’ (ত্বোয়াহা ২০/১০)। একথা দৃষ্টে মনে হয়, মূসা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন।[21] পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে প্রধান সড়কে বিপদাশংকা ছিল। তাই শ্বশুরের উপদেশ মোতাবেক তিনি পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অপরিচিত রাস্তায় চলতে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে পথ হারিয়ে ডান দিকে চলে তূর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। মূলতঃ এ পথ হারানোটা ছিল আল্লাহর মহা পরিকল্পনারই অংশ।

মূসা আশান্বিত হয়ে যতই আগুনের নিকটবর্তী হন, আগুনের হল্কা ততই পিছাতে থাকে। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, সবুজ বৃক্ষের উপরে আগুন জ্বলছে। অথচ গাছের পাতা পুড়ছে না; বরং তার উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে যাচ্ছে। বিস্ময়ে অভিভূত মূসা এক দৃষ্টে আগুনটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর আওয়ায কানে এলো তাঁর চার পাশ থেকে। মনে হ'ল পাহাড়ের সকল প্রান্ত থেকে একই সাথে আওয়ায আসছে। মূসা তখন তূর পাহাড়ের ডান দিকে 'তুবা' (طُوَى) উপত্যকায় দন্ডায়মান। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى- إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى- (طه-১১-১২)-

'অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়ায এলো, হে মূসা!' 'আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। তুমি পবিত্র উপত্যকা তুবায় রয়েছ' (ত্বোয়াহা ২০/১১-১২)। এর দ্বারা বিশেষ অবস্থায় পবিত্র স্থানে জুতা খোলার আদব প্রমাণিত হয়। যদিও পাক জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয।[22] অতঃপর আল্লাহ বলেন,

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى- إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي- إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى- فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى- (طه-১৩-১৬)

'আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব তোমাকে যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক'। 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর'। 'ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে প্রত্যেকে তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে'। 'সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে (ক্বিয়ামত বিষয়ে সতর্ক থাকা হ'তে) নিবৃত্ত না করে। তাহ'লে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে' (ত্বোয়াহা ২০/১৩-১৬)।

এ পর্যন্ত আক্বীদা ও ইবাদতগত বিষয়ে নির্দেশ দানের পর এবার কর্মগত নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলছেন,

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى- قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى- قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى- فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى- قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى- (طه-(১৭-২১

‘হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি?’ ‘মূসা বললেন, এটা আমার লাঠি। এর উপরে আমি ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে নামাই। তাছাড়া এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও চলে’। ‘আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি ওটা ফেলে দাও’। ‘অতঃপর তিনি ওটা (মাটিতে) ফেলে দিতেই তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল’। ‘আল্লাহ বললেন, তুমি ওটাকে ধর, ভয় করো না, আমি এখুনি ওকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব’ (ত্বোয়াহা ২০/১৭-২১)।

এটি ছিল মূসাকে দেওয়া ১ম মু‘জেযা। কেননা মিসর ছিল ঐসময় জাদুবিদ্যায় শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশ। সেখানকার শ্রেষ্ঠ জাদুকরদের হারিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই নবুঅতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। সেজন্যই আল্লাহ মূসাকে

সবদিক দিয়ে প্রস্ত্তত করে দিচ্ছিলেন। এর ফলে মূসা নিজের মধ্যে অনেকটা শক্তি ও স্বস্তি লাভ করলেন।

১ম মু‘জেযা প্রদানের পর আল্লাহ তাকে দ্বিতীয় মু‘জেযা প্রদানের উদ্দেশ্যে বললেন,

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى- لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى- (طه-(২২-২৩

‘তোমার হাত বগলে রাখ। তারপর দেখবে তা বের হয়ে আসবে উজ্জ্বল ও নির্মল আলো হয়ে, অন্য একটি নিদর্শন রূপে’। ‘এটা এজন্য যে, আমরা তোমাকে আমাদের বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু অংশ দেখাতে চাই’ (ত্বোয়াহা ২০/২২-২৩)।

[19]. বুখারী হা/২৪৮৭ ‘সাক্ষ্য সমূহ’ অধ্যায় ২৮ অনুচ্ছেদ।
[20]. মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৩৭৬ পৃঃ হা/৩৩২০, সনদ ছহীহ; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২২৮।
[21]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩১।
[22]. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৬৬, ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘সতর’ অনুচ্ছেদ-৮।

নয়টি নিদর্শন

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ- (إسراء 101)- ‘আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন প্রদান করেছিলাম’ (ইসরা ১৭/১০১; নামল ২৭/১২)। এখানে ‘নিদর্শন’ অর্থ একদল বিদ্বান ‘মু‘জেযা’ নিয়েছেন। তবে ৯ সংখ্যা উল্লেখ করায় এর বেশী না হওয়াটা যরূরী নয়। বরং এর চেয়ে অনেক বেশী মু‘জেযা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন পাথরে লাঠি মারায় ১২টি গোত্রের জন্য বারোটি ঝর্ণাধারা নির্গমন, তীহ্ প্রান্তরে মেঘের ছায়া প্রদান, মান্না-সালওয়া খাদ্য অবতরণ প্রভৃতি। তবে এ নয়টি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা ফেরাঊনী সম্প্রদায়কে প্রদর্শন করা হয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) উক্ত ৯টি মু‘জেযা নিম্নরূপে গণনা করেছেন। যথা- (১) মূসা (আঃ)-এর ব্যবহৃত লাঠি, যা নিক্ষেপ করা মাত্র অজগর সাপের ন্যায় হয়ে যেত (২) শুভ্র হাত, যা বগলের নীচ থেকে বের করতেই জ্যোতির্ময় হয়ে সার্চ লাইটের মত চমকাতে থাকত (৩) নিজের তোতলামি, যা মূসার প্রার্থনাক্রমে দূর করে দেওয়া হয় (৪) ফেরাঊনী কওমের উপর প্লাবণের গযব প্রেরণ (৫) অতঃপর পঙ্গপাল (৬) উকুন (৭) ব্যাঙ (৮) রক্ত এবং অবশেষে (৯) নদী ভাগ করে তাকে সহ বনু ইস্রাঈলকে সাগরডুবি হ’তে নাজাত দান। তবে প্রথম দু’টিই ছিল সর্বপ্রধান মু‘জেযা, যা নিয়ে তিনি শুরুতে ফেরাঊনের নিকটে গিয়েছিলেন (নমল ২৭/১০, ১২)।

অবশ্য কুরআনে বর্ণিত আয়াত সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে ফেরাঊনের সম্প্রদায়ের উপরে দুর্ভিক্ষের গযব এসেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ- (الأعراف ১৩০)- ‘আমরা পাকড়াও করেছিলাম ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’ (আ‘রাফ ৭/১৩০)।

ওদিকে মূসার প্রার্থনা কবুলের সাথে সাথে আল্লাহ হারূণকে মিসরে অহীর মাধ্যমে নবুঅত প্রদান করলেন (মারিয়াম ১৯/৫৩) এবং তাকে মূসার আগমন বার্তা জানিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে মূসাকে সার্বিক সহযোগিতা করার এবং তাকে মিসরের বাইরে এসে অভ্যর্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি বনু ইস্রাঈলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এগিয়ে এসে যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করেন।[23]

[23]. কুরতুবী, তাফসীরে ইবনু কাছীর ‘হাদীছুল ফুতূন’; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২৩৭।

মূসার পাঁচটি দো‘আ

প্রথম দো‘আ : رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِى ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন’। অর্থাৎ নবুঅতের বিশাল দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত জ্ঞান ও দূরদর্শিতার উপযোগী করে দিন এবং আমার হৃদয়কে এমন প্রশস্ত করে দিন, যাতে উম্মতের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে প্রাপ্ত অপবাদ ও দুঃখ-কষ্ট বহনে তা সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় দো‘আ : وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِى ‘আমার কর্ম সহজ করে দিন’। অর্থাৎ নবুঅতের কঠিন দায়িত্ব বহনের কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কারু পক্ষেই কোন কাজ সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মূসা (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফেরাঊনের মত একজন দুর্ধর্ষ, যালেম ও রক্ত পিপাসু সম্রাটের নিকটে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, আল্লাহর একান্ত সাহায্য ব্যতীত।

তৃতীয় দো‘আ : وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِى ‘আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে’। কেননা রেসালাত ও দাওয়াতের জন্য রাসূল ও দাঈকে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়া একান্ত আবশ্যক। মূসা (আঃ) নিজের এ ত্রুটি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটে বিশেষভাবে প্রার্থনা করেন। পরবর্তী আয়াতে যেহেতু তাঁর সকল প্রার্থনা কবুলের কথা বলা হয়েছে’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৬),

সেহেতু এ প্রার্থনাটিও যে কবুল হয়েছিল এবং তাঁর তোতলামি দূর হয়ে গিয়েছিল, সেকথা বলা যায়।

চতুর্থ দো‘আ : وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُوْنَ أَخِي ‘আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন উযীর নিয়োগ করুন’। ‘

পঞ্চম দো‘আ : وَأَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِي ‘এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন’। অর্থাৎ তাকে আমার নবুঅতের কাজে শরীক করে দিন। ‘যাতে আমরা বেশী বেশী আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৩-৩৪)। এটা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে এবং আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ যরূরী। একারণেই তিনি সৎ ও নির্ভরযোগ্য সাথী ও সহযোগী হিসাবে বড় ভাই হারূণকে নবুঅতে শরীক করার জন্য আল্লাহর নিকটে দো‘আ করেন। তাছাড়া তিনি একটি আশংকার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে’। ‘আমার ভাই হারূণ, সে আমার অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন যোগাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে’ (ক্বাছাছ ২৮/৩৩-৩৪)।

উক্ত পাঁচটি দো‘আ শেষ হবার পর সেগুলি কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন, قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسَى ‘হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হ’ল’ (ত্বোয়াহা ২০/৩৬)। এমনকি মূসার সাহস বৃদ্ধির জন্য سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ ‘আমরা তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহুকে সবল করব এবং তোমাদের দু’জনকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছেই ঘেঁষতে পারবে না। তাছাড়া আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা (দু’ভাই) এবং তোমাদের অনুসারীরা (শত্রুপক্ষের উপরে) বিজয়ী থাকবে’ (ক্বাছাছ ২৮/৩৫)।

[24]. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ত্বোয়াহা ২০/৪০।

ফেরাউনের নিকটে মূসা (আঃ)-এর দাওয়াত

আল্লাহর নির্দেশমত মূসা ও হারূণ ফেরাঊন ও তার সভাসদবর্গের নিকটে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর মূসা ফেরাঊনকে বললেন,

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ- حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُوْلَ

عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ- (الأعراف-১০৪-১০৫)-

'হে ফেরাঊন! আমি বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হ'তে প্রেরিত রাসূল'। 'আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি দৃঢ়চিত্ত। আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শন নিয়ে আগমন করেছি। অতএব তুমি বনু ইস্রাঈলগণকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও' (আ'রাফ ৭/১০৪-১০৫)। মূসার এদাবী থেকে বুঝা যায় যে, ঐ সময় বনু ইস্রাঈলের উপরে ফেরাঊনের ও তার সম্প্রদায়ের যুলুম চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং তাদের সঙ্গে আপোষে বসবাসের কোন রাস্তা ছিল না। ফলে তিনি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে চাইলেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, মূসা তখনই বনু ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হয়ে যাননি। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত বর্ণনা করব।

মূসা ফেরাঊনকে বললেন,

وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى- إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى- (طه-৪৭-৪৮)

....'তুমি বনু ইস্রাঈলদের উপরে নিপীড়ন করো না'। 'আমরা আল্লাহর নিকট থেকে অহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপরে আল্লাহর আযাব নেমে আসে' (ত্বোয়াহা ২০/৪৭-৪৮)। একথা শুনে ফেরাঊন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'মূসা! তোমার পালনকর্তা কে'? 'মূসা বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন'। 'ফেরাঊন বলল, তাহ'লে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি?' 'মূসা

বললেন, তাদের খবর আমার প্রভুর কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না’। একথা বলার পর মূসা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ বর্ণনা শুরু করলেন, যাতে ফেরাঊন তার যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা তিনি, ‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন এবং তাতে চলার পথ সমূহ তৈরী করেছেন। তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন’। ‘তোমরা তা আহার কর ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহ চরিয়ে থাক। নিশ্চয়ই এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে’ (ত্বোয়াহা ২০/৪৯-৫৪)।

মূসা (আঃ)-এর দাওয়াতের সার-সংক্ষেপ

১. বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহর দিকে আহবান।

২. আল্লাহ প্রেরিত সত্যই প্রকৃত সত্য। তার ব্যতিক্রম কিছু না বলা বা না করার ব্যাপারে সর্বদা দৃঢ়চিত্ত থাকার ঘোষণা প্রদান।

৩. আল্লাহর গযবের ভয় প্রদর্শন।

৪. আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ।

৫. পিছনের লোকদের কৃতকর্মের হিসাব আল্লাহর উপরে ন্যস্ত করে বর্তমান অবস্থার সংশোধনের প্রতি আহবান।

৬. মযলূম বনু ইস্রাঈলের মুক্তির জন্য যালেম ফেরাঊনের নিকটে আবেদন।

মু‘জেযা ও জাদু

মু‘জেযা অর্থ মানুষের বুদ্ধিকে অক্ষমকারী। অর্থাৎ এমন কর্ম সংঘটিত হওয়া যা মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা বহির্ভূত। (১) ‘মু‘জেযা’ কেবল নবীগণের জন্য খাছ এবং ‘কারামত’ আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের মাধ্যমে কখনো কখনো প্রকাশ করে থাকেন। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। (২) মু‘জেযা নবীগণের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ

থেকে হয়। পক্ষান্তরে জাদু কেবল দুষ্ট জিন ও মানুষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং তা হয় অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে। (৩) জাদু কেবল পৃথিবীতেই ক্রিয়াশীল হয়, আসমানে নয়। কিন্তু মু'জেযা আল্লাহর হুকুমে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন শেষনবী (ছাঃ)-এর অঙ্গুলী সংকেতে আকাশের চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছিল। (৪) মু'জেযা মানুষের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু জাদু স্রেফ ভেল্কিবাজি ও প্রতারণা মাত্র এবং যা মানুষের কেবল ক্ষতিই করে থাকে।

জাদুতে মানুষের সাময়িক বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে। যা মানুষকে প্রতারিত করে। এজন্যে একে ইসলামে হারাম করা হয়েছে। মিসরীয় জাতি তথা ফেরাঊনের সম্প্রদায় ঐ সময় জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল এবং জ্যোতিষীদের প্রভাব ছিল তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যধিক। সেকারণ তাদের চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী মূসা (আঃ)-এর মু'জেযাকে তারা বড় ধরনের একটা জাদু ভেবেছিল মাত্র। তবে তারা তাঁকে সাধারণ জাদুকর নয়, বরং 'বিজ্ঞ জাদুকর' (سَاحِرٌ عَلِيْم) বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল (আ'রাফ ৭/১০৯)। কারণ তাদের হিসাব অনুযায়ী মূসার জাদু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যা তাদের আয়ত্তাধীন জাদু বিদ্যার বাইরের এবং যা ছিল অনুপম ও অনন্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত।

পরবর্তীকালে সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে ইরাকের বাবেল নগরী তৎকালীন পৃথিবীতে জাদু বিদ্যায় শীর্ষস্থান লাভ করে। তখন আল্লাহ সুলায়মান (আঃ)-কে জিন, ইনসান, বায়ু ও পশুপক্ষীর উপর ক্ষমতা দিয়ে পাঠান। এগুলিকে লোকেরা জাদু ভাবে এবং তার নবুঅতকে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য বুঝানোর জন্য প্রেরণ করেন। যাতে লোকেরা জাদুকরদের তাবেদারী ছেড়ে নবীর তাবেদার হয়।

ফেরাঊন মূসা (আঃ)-কে বলল, 'হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য আগমন করেছ'? 'তাহ'লে আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব। অতএব আমাদের ও তোমার মধ্যে কোন একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে একটা ওয়াদার দিন ধার্য কর, যার খেলাফ আমরাও করব না, তুমিও করবে না'। 'মূসা বললেন, 'তোমাদের ওয়াদার দিন হবে তোমাদের উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্ণেই লোকজন সমবেত হবে' (ত্বোয়াহা ২০/৫৭-৫৯)।

জাদুকররা ফেরাঊনের নিকট সমবেত হয়ে বলল, জাদুকর ব্যক্তিটি কি দিয়ে কাজ করে? সবাই বলল, সাপ দিয়ে। তারা বলল, আল্লাহর কসম! পৃথিবীতে আমাদের উপরে এমন কেউ নেই, যে লাঠি ও রশিকে সাপ বানিয়ে কাজ করতে পারে ('হাদীছুল কুতূন' নাসাঈ, ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর)। অতএব 'আমাদের জন্য কি বিশেষ কোন পুরস্কার আছে, যদি আমরা বিজয়ী হই'? 'সে বলল, হ্যাঁ। তখন অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (আ'রাফ ৭/১১৩-১১৪)।

জাদুকররা উৎসাহিত হয়ে মূসাকে বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি (তোমার জাদুর লাঠি) নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি' (ত্বোয়াহা ২০/৬৫)। মূসা বললেন, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তারা 'তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল' (শো'আরা ২৬/৪৪), তখন লোকদের চোখগুলিকে ধাঁধিয়ে দিল এবং তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল ও এক মহাজাদু প্রদর্শন করল' (আ'রাফ ৭/১১৬)। 'তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার মনে হ'ল যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করছে'। 'তাতে মূসার মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হ'ল' (ত্বোয়াহা ২০/৬৬-৬৭)। এমতাবস্থায় আল্লাহ 'অহি' নাযিল করে মূসাকে অভয় দিয়ে বললেন, قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى- وَأَلْقِ مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى- (طه 68-69)- 'তুমিই বিজয়ী হবে' 'তোমার ডান হাতে যা আছে, তা (অর্থাৎ লাঠি) নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সবকিছুকে যা তারা করেছে, গ্রাস করে ফেলবে। তাদের ওসব তো জাদুর খেল মাত্র। বস্তুতঃ জাদুকর যেখানেই থাকুক সে সফল হবে না' (ত্বোয়াহা ২০/৬৮-৬৯)।

জাদুকররা তাদের রশি ও লাঠি সমূহ নিক্ষেপ করার সময় বলল, وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ- (الشعراء 44)- 'ফেরাঊনের মর্যাদার শপথ! আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব' (শো'আরা ২৬/৪৪)। তারপর মূসা (আঃ) আল্লাহর নামে লাঠি নিক্ষেপ করলেন। দেখা গেল তা বিরাট অজগর সাপের ন্যায় রূপ ধারণ করল এবং জাদুকরদের সমস্ত অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল' (শো'আরা ২৬/৪৫)।

এদৃশ্য দেখে যুগশ্রেষ্ঠ জাদুকরগণ বুঝে নিল যে, মূসার এ জাদু আসলে জাদু নয়। কেননা জাদুর সর্বোচ্চ বিদ্যা তাদের কাছেই রয়েছে। মূসা তাদের চেয়ে বড় জাদুকর হ'লে এতদিন তার নাম শোনা যেত। তার উস্তাদের খবর জানা যেত। তাছাড়া তার যৌবনকাল অবধি সে আমাদের কাছেই ছিল। কখনোই তাকে জাদু শিখতে বা জাদু খেলা দেখাতে বা জাদুর প্রতি কোনরূপ আকর্ষণও তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। তার পরিবারেও কোন জাদুকর নেই। তার বড় ভাই হারূণ তো সর্বদা আমাদের মাঝেই দিনাতিপাত করেছে। কখনোই তাকে এসব করতে দেখা যায়নি বা তার মুখে এখনকার মত বক্তব্য শোনা যায়নি। হঠাৎ করে কেউ বিশ্বসেরা জাদুকর হয়ে যেতে পারে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অলৌকিক কোন সত্তার নিদর্শন রয়েছে, যা আয়ত্ত করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এ সময় মূসার দেওয়া তাওহীদের দাওয়াত ও আল্লাহর গযবের ভীতি তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। আল্লাহ বলেন, فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ- (الأعراف ১১৮-১১৯)- 'অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং বাতিল হয়ে গেল তাদের সমস্ত জাদুকর্ম'। 'এভাবে তারা সেখানেই পরাজিত হ'ল এবং লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল' (আ'রাফ ৭/১১৮-১১৯)। অতঃপর فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ- (الشعراء ৪৬-৪৮)- 'তারা সিজদায় পড়ে গেল'। এবং 'বলে উঠল, আমরা বিশ্বচরাচরের পালনকর্তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যিনি মূসা ও হারূণের রব' (শো'আরা ২৬/৪৬-৪৮; ত্বোয়াহা ২০/৭০; আ'রাফ ৭/১২০-১২১)।

পরাজয়ের এ দৃশ্য দেখে ভীত-বিহবল ফেরাঊন নিজেকে সামলে নিয়ে উপস্থিত লাখো জনতার মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য জাদুকরদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, - آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ- (طه ৭১) 'আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয়ই সে (অর্থাৎ মূসা) তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে' (ত্বোয়াহা ২০/৭১; আ'রাফ ৭/১২৩; শো'আরা ২৬/৪৯)। অতঃপর সম্রাট সুলভ হুমকি দিয়ে বলল, فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ- (الشعراء ৪৯)- 'শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পরিণাম ফল জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব' (শো'আরা ২৬/৪৯)। জবাবে জাদুকররা বলল, لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ- إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ

(الشعراء -كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ৫০-৫১)- ‘কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব’(৫০)। ‘আশা করি আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ ক্ষমা করবেন’ (শো‘আরা ২৬/৪৯-৫১; ত্বোয়াহা ২০/৭১-৭৩; আ‘রাফ ৭/১২৪-১২৬)।

হযরত ইউনুস (আলাইহিস সালাম)

ইউনুস (আঃ)-এর কওম

হযরত ইউনুস বিন মাত্তা (আঃ)-এর কথা পবিত্র কুরআনের মোট ৬টি সূরার ১৮টি আয়াতে[1] বর্ণিত হয়েছে। সূরা ইউনুস ৯৮ আয়াতে তাঁর নাম ইউনুস, সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াতে 'যুন-নূন' (ذو النون) এবং সূরা ক্বলম ৪৮ আয়াতে তাঁকে 'ছাহেবুল হূত' (صاحب الحوت) বলা হয়েছে। 'নূন' ও 'হূত' উভয়ের অর্থ মাছ। যুন-নূন ও ছাহেবুল হূত অর্থ মাছওয়ালা। একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন। সামনে তা বিবৃত হবে।

ইউনুস (আঃ)-এর কওম :

ইউনুস (আঃ) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' (نينوى) জনপদের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত হন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানান। কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। বারবার দাওয়াত দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হ'লে আল্লাহর হুকুমে তিনি এলাকা ত্যাগ করে চলে যান। ইতিমধ্যে তার কওমের উপরে আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বাভাস দেখা দিল। জনপদ ত্যাগ করার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, তিনদিন পর সেখানে গযব নাযিল হ'তে পারে। তারা ভাবল, নবী কখনো মিথ্যা বলেন না। ফলে ইউনুসের কওম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত কুফর ও শিরক হ'তে তওবা করে এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এবং গবাদিপশু সব নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা বাচ্চাদের ও গবাদিপশু গুলিকে পৃথক করে দেয় এবং নিজেরা আল্লাহর দরবারে কায়মনোচিত্তে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তারা সর্বান্ত:করণে তওবা করে এবং আসন্ন গযব হ'তে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا آمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ- (يونس-৯৮)

‘অতএব কোন জনপদ কেন এমন হ’ল না যে, তারা এমন সময় ঈমান নিয়ে আসত, যখন ঈমান আনলে তাদের উপকারে আসত? কেবল ইউনুসের কওম ব্যতীত। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমরা তাদের উপর থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক আযাব তুলে নিলাম এবং তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপকরণ ভোগ করার অবকাশ দিলাম’ (ইউনুস ১০/৯৮)। অত্র আয়াতে ইউনুসের কওমের প্রশংসা করা হয়েছে।

ওদিকে ইউনুস (আঃ) ভেবেছিলেন যে, তাঁর কওম আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আদৌ গযব নাযিল হয়নি, তখন তিনি চিন্তায় পড়লেন যে, এখন তার কওম তাকে মিথ্যাবাদী ভাববে এবং মিথ্যাবাদীর শাস্তি হিসাবে প্রথা অনুযায়ী তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি জনপদে ফিরে না গিয়ে অন্যত্র হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি।

[1]. যথাক্রমে (১) সূরা নিসা ৪/১৬৩; (২) আন‘আম ৬/৮৬; (৩) ইউনুস ১০/৯৮; (৪) আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮; (৫) ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪৮; (৬) ক্বলম ৬৮/৪৮-৫০। সর্বমোট = ১৮টি

মাছের পেটে ইউনুস

আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ- إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ- فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ- (الصافات-১৩৯-১৪২)

‘আর ইউনুস ছিল পয়গম্বরগণের একজন’। ‘যখন সে পালিয়ে যাত্রী বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছল’। ‘অতঃপর লটারীতে সে অকৃতকার্য হ’ল’। ‘অতঃপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ছিল নিজেকে ধিক্কার দানকারী’ (ছাফফাত ৩৭/১৩৯-১৪২)।

আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ইউনুস (আঃ) নিজ কওমকে ছেড়ে এই হিজরতে বেরিয়েছিলেন বলেই অত্র আয়াতে তাকে মনিবের নিকট থেকে পলায়নকারী বলা হয়েছে। যদিও বাহ্যত এটা কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীলগণের মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তাদের ছোট-খাট ত্রুটির জন্যও পাকড়াও করেন। ফলে তিনি আল্লাহর পরীক্ষায় পতিত হন।

হিজরতকালে নদী পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎ নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম হ'লে মাঝি বলল, একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। নইলে সবাইকে ডুবে মরতে হবে। এজন্য লটারী হ'লে পরপর তিনবার তাঁর নাম আসে। ফলে তিনি নদীতে নিক্ষিপ্ত হন। সাথে সাথে আল্লাহর হুকুমে বিরাটকায় এক মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলে। কিন্তু মাছের পেটে তিনি হযম হয়ে যাননি। বরং এটা ছিল তাঁর জন্য নিরাপদ কয়েদখানা (ইবনে কাছীর, আম্বিয়া ৮৭-৮৮)। মাওয়ার্দী বলেন, মাছের পেটে অবস্থান করাটা তাঁকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন পিতা তার শিশু সন্তানকে শাসন করে শিক্ষা দিয়ে থাকেন' (কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)।

ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে কত সময় বা কতদিন ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- (১) এক ঘণ্টা ছিলেন (২) তিনি পূর্বাহ্নে প্রবেশ করে অপরাহ্নে বেরিয়ে আসেন (৩) ৩ দিন ছিলেন (৪) ৭ দিন ছিলেন (৫) ২০ দিন ছিলেন (৬) ৪০ দিন ছিলেন।[2] আসলে এইসব মতভেদের কোন গুরুত্ব নেই। কেননা এসবের রচয়িতা হ'ল ইহুদী গল্পকারগণ। প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ ভাল জানেন।

[2]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১৮ পৃঃ; কুরতুবী, তাফসীর সূরা ছাফফাত ১৪৪।

ইউনুস কেন মাছের পেটে গেলেন?

এ বিষয়ে জনৈক আধুনিক মুফাসসির বলেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি ঘটায় এবং সময়ের পূর্বেই এলাকা ত্যাগ করায় তাকে এই পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। আর নবী চলে যাওয়ার কারণেই তার সম্প্রদায়কে আযাব দানে আল্লাহ সম্মত হননি'। অথচ পুরা দৃষ্টিকোণটাই ভুল। কেননা কোন নবী থেকেই তাঁর নবুঅতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটির কল্পনা করা নবীগণের নিষ্পাপত্বের আক্বীদার ঘোর বিপরীত। বরং তিনদিন পর আযাব আসবে, আল্লাহর পক্ষ হ'তে এরূপ নির্দেশনা পেয়ে তাঁর হুকুমেই তিনি এলাকা

ত্যাগ করেছিলেন। আর তার কওম থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের আন্তরিক তওবার কারণে, নবী চলে যাওয়ার কারণে নয়।[3]

[3]. দ্রঃ তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ, সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৬১৭-১৮।

ইউনুস মুক্তি পেলেন

আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ- لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ- فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ- وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَّقْطِيْنٍ- وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ- فَآمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِيْنٍ- (الصافات-১৪৩-১৪৮)

'অতঃপর যদি সে আল্লাহর গুণগানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হ'ত'(ছাফফাত ১৪৩)। 'তাহ'লে সে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকত'? (১৪৪)।'অতঃপর আমরা তাকে একটি বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন সে রুগ্ন ছিল'(১৪৫)। 'আমরা তার উপরে একটি লতা বিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্গত করলাম'(১৪৬)। 'এবং তাকে লক্ষ বা তদোধিক লোকের দিকে প্রেরণ করলাম'(১৪৭)। 'তারা ঈমান আনল। ফলে আমরা তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিলাম' (ছাফফাত ৩৭/১৪৩-১৪৮)।

আলোচ্য আয়াতে 'ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত সে মাছের পেটেই থাকত'-এর অর্থ সে আর জীবিত বেরিয়ে আসতে পারতো না। বরং মাছের পেটেই তার কবর হ'ত এবং সেখান থেকেই ক্বিয়ামতের দিন তার পুনরুত্থান হ'ত।

'যদি আল্লাহর অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তাহ'লে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে থাকত'-এর অর্থ আল্লাহ যদি তাকে তওবা করার তাওফীক্ব না দিতেন এবং তার দো'আ কবুল না করতেন, তাহ'লে তাকে জীবিত অবস্থায় নদী তীরে মাটির উপর ফেলতেন না। যেখানে গাছের পাতা খেয়ে তিনি পুষ্টি ও শক্তি লাভ করেন। বরং তাকে মৃত অবস্থায় নদীর কোন বালুচরে ফেলে রাখা হ'ত, যা তার জন্য লজ্জাষ্কর হ'ত।

‘অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন’ অর্থ এটা নয় যে, ইতিপূর্বে আল্লাহ ইউনুসকে মনোনীত করেননি; বরং এটা হ’ল বর্ণনার আগপিছ মাত্র। কুরআনের বহু স্থানে এরূপ রয়েছে। এখানে এর ব্যাখ্যা এই যে, ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায় আল্লাহ তাকে পুনরায় কাছে টানলেন ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

ইউনুস (আঃ)-এর উক্ত দো‘আ ‘দো‘আয়ে ইউনুস’ নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

دعوةُ ذى النون إذْ دعا رَبَّهُ وهو فى بطن الحوتِ (لآ إله إلا أنت سُبْحَانَكَ إنى كنتُ من الظ

المين) لم يَدْعُ بها رجلٌ مسلمٌ فى شيءٍ إلاَّ اسْتَجَابَ لَهُ، رواه الترمذى-

‘বিপদগ্রস্ত কোন মুসলমান যদি (নেক মকছূদ হাছিলের নিমিত্তে) উক্ত দো‘আ পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা কবুল করেন’।[5] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لا تُفَضِّلُوْا بين أنبياء الله وما يَنْبَغِيْ لعبدٍ أن يَّقولَ : إنِّي خيرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى، متفق عليه-

‘তোমরা আল্লাহর নবীগণের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য করো না। আর কোন বান্দার জন্য এটা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তার চাইতে উত্তম’।[6] কুরতুবী এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) এটা এজন্য বলেছেন যে, তিনি যেমন (মি‘রাজে) সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহর নিকটবর্তী হয়েছিলেন, নদীর অন্ধকার গর্ভে মাছের পেটের মধ্যে তেমনি আল্লাহ ইউনুস-এর নিকটবর্তী হয়েছিলেন (কুরতুবী, আম্বিয়া ৮৭)। বস্ত্ততঃ এটা ছিল রাসূলের নিরহংকার স্বভাব ও বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(১) বিভ্রান্ত কওমের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তাদেরকে ছেড়ে চলে যাওয়া কোন সমাজ সংস্কারকের উচিত নয়।

(২) আল্লাহ তার নেক বান্দার উপর শাস্তি আরোপ করবেন না, যেকোন সংকটে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

(৩) আল্লাহর পরীক্ষা কিরূপ হবে, তা পরীক্ষা আগমনের এক সেকেন্ড পূর্বেও জানা যাবে না।

(৪) কঠিনতম কষ্টের মুহূর্তে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

(৫) খালেছ তওবা ও আকুল প্রার্থনার ফলে অনেক সময় আল্লাহ গযব উঠিয়ে নিয়ে থাকেন। যেমন ইউনুসের কওমের উপর থেকে আল্লাহ গযব ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

(৬) আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেকোন পরিবেশে ঈমানদারকে রক্ষা করে থাকেন।

(৭) পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ও জলচর প্রাণী সবাই আল্লাহর হুকুমে ঈমানদার ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হয়। যেমন মাছ ও লতা জাতীয় গাছ ইউনুসের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

(৮) আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ব্যতীত দো'আ কবুল হয় না। যেমন গভীর সংকটে নিপতিত হবার আগে ও পরে ইউনুস আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন। ফলে আল্লাহ তার দো'আ কবুল করেন।

১০) আল্লাহর প্রতিটি কর্ম তার নেককার বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। যা বান্দা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে। যেমন ইউনুস পরে বুঝতে পেরে আল্লাহর প্রতি অধিক অনুগত হন এবং এজন্য তিনি আল্লাহর প্রতি অধিক প্রত্যাবর্তনশীল (أَوَّابٌ) বলে আল্লাহর প্রশংসা পান।

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)

হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন বনু ইস্রাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি 'ইনজীল' প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরপর থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আর কোন নবী আগমন করেননি। এই সময়টাকে فترة الرسل বা 'রাসূল আগমনের বিরতিকাল' বলা হয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত কাল পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং মুহাম্মাদী শরী'আত অনুসরণে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে সারা পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য কায়েম করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর সাথে বিশ্ব সংস্কারে ব্রতী হবেন। তাই তাঁর সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত ধারণা দেওয়া অত্যন্ত যরূরী বিবেচনা করে আল্লাহ পাক শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদীরা তাঁকে নবী বলেই স্বীকার করেনি। অত্যন্ত লজ্জাষ্করভাবে তারা তাঁকে জনৈক ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে (নাঊযুবিল্লাহ)। অন্যদিকে ঈসা (আঃ)-এর ভক্ত ও অনুসারী হবার দাবীদার খৃষ্টানরা বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'আল্লাহর পুত্র' (তওবাহ ৯/৩০) বানিয়েছে'। বরং ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা তাঁকে সরাসরি 'আল্লাহ' সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, তিনি হ'লেন তিন আল্লাহর একজন (ثَالِثُ ثَلَثَةٍ =মায়েদাহ ৭৩)। অর্থাৎ ঈসা, মারিয়াম ও আল্লাহ প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তারা এটাকে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে ক্ষান্ত হয়। অথচ এরূপ ধারণা পোষণকারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে 'কাফের' বলে ঘোষণা করেছেন (মায়েদাহ ৫/৭২-৭৩)। কুরআন তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছে। আমরা এখন সেদিকে মনোনিবেশ করব।

ঈসার জন্ম ও লালন-পালন

এভাবে মেহরাবে অবস্থান করে মারিয়াম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমত করতে থাকেন। সম্মানিত নবী ও মারিয়ামের বয়োবৃদ্ধ খালু যাকারিয়া (আঃ) সর্বদা তাকে দেখাশুনা করতেন। মেহরাবের উত্তর-পূর্বদিকে সম্ভবতঃ খেজুর বাগান ও ঝর্ণাধারা ছিল। যেখানে মারিয়াম পর্দা টাঙিয়ে মাঝে-মধ্যে পায়চারি করতেন। অভ্যাসমত তিনি উক্ত নির্জন স্থানে একদিন পায়চারি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মানুষের বেশে সেখানে জিবরাঈল

উপস্থিত হন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে মারিয়াম ভীত হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا- فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا- قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا- قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا- قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا- قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا- (مريم ১৬-২১)-

(হে মুহাম্মাদ!) ‘আপনি এই কিতাবে মারিয়ামের কথা বর্ণনা করুন। যখন সে তার পরিবারের লোকজন হ’তে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিল’ (মারিয়াম ১৬)। ‘অতঃপর সে তাদের থেকে আড়াল করার জন্য পর্দা টাঙিয়ে নিল। অতঃপর আমরা তার নিকটে আমাদের ‘রূহ’ (অর্থাৎ জিব্রীলকে) প্রেরণ করলাম। সে তার কাছে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল’ (১৭)। ‘মারিয়াম বলল, আমি তোমার থেকে করুণাময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি আল্লাহভীরু হও’ (১৮)। ‘সে বলল, আমি তো কেবল তোমার প্রভুর প্রেরিত। এজন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করে যাব’ (১৯)। ‘মারিয়াম বলল, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণী নই’ (২০)। ‘সে বলল, এভাবেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ ব্যাপার এবং আমরা তাকে (ঈসাকে) মানবজাতির জন্য একটা নিদর্শন ও আমাদের পক্ষ হ’তে বিশেষ অনুগ্রহরূপে পয়দা করতে চাই। তাছাড়া এটা (পূর্ব থেকেই) নির্ধারিত বিষয়’ (মারিয়াম ১৯/১৬-২১)। অতঃপর জিব্রীল মারিয়ামের মুখে অথবা তাঁর পরিহিত জামায় ফুঁক মারলেন এবং তাতেই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হ’ল (আম্বিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)। অন্য আয়াতে একে ‘আল্লাহর কলেমা’ (بِكَلِمَةٍ مِنْه) অর্থাৎ ‘কুন্’ (হও) বলা হয়েছে (আলে ইমরান ৩/৪৫)।

অতঃপর আল্লাহ বলেন,

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا- فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا- فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا- وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا- فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُوْلِيْ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا- (مريم-২২-২৬)

'অতঃপর মারিয়াম গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং তৎসহ একটু দূরবর্তী স্থানে চলে গেল' (মারিয়াম ২২)। 'এমতাবস্থায় প্রসব বেদনা তাকে একটি খর্জুর বৃক্ষের মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তখন সে বলল, হায়! আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং আমি যদি মানুষের স্মৃতি থেকে

বিলুপ্ত হয়ে যেতাম' (২৩)। 'এমন সময় ফেরেশতা তাকে নিম্নদেশ থেকে (অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি থেকে) আওয়ায দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন' (২৪)। 'আর তুমি খর্জুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার দিকে সুপক্ক খেজুর পতিত হবে' (২৫)। 'তুমি আহার কর, পান কর এং স্বীয় চক্ষু শীতল কর। আর যদি কোন মানুষকে তুমি দেখ, তবে তাকে বলে দিয়ো যে, আমি দয়াময় আল্লাহর জন্য ছিয়াম পালনের মানত করেছি। সুতরাং আমি আজ কারু সাথে কোন মতেই কথা বলব না' (মারিয়াম ১৯/২২-২৬)।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ- الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ- (آل عمران-৫৯-৬০)

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে ঈসার দৃষ্টান্ত হ'ল আদমের মত। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন এবং বলেন, হয়ে যাও ব্যস হয়ে গেল'। 'যা তোমার প্রভু আল্লাহ বলেন, সেটাই সত্য। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (আলে ইমরান ৩/৫৯-৬০)। অর্থাৎ আদমকে যেমন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই শুধু মায়ের মাধ্যমেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটাই যে সত্য এবং এর বাইরে

যাবতীয় জল্পনা-কল্পনা যে মিথ্যা, সে কথাও উপরোক্ত আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্য এই যে, যে বনু ইস্রাঈলের নবী ও রাসূল হয়ে ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটলো, সেই ইহুদী-নাছারারাই আল্লাহর উক্ত ঘোষণাকে মিথ্যা বলে গণ্য করেছে। অথচ এই হতভাগারা মারিয়ামের পূর্বদিকে যাওয়ার অনুসরণে পূর্বদিককে তাদের ক্বিবলা বানিয়েছে।[3]

(২) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মারিয়ামকে খেজুর গাছের কান্ড ধরে নাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে সুপক্ক খেজুর নীচে পতিত হয়। এটাতে বুঝা যায় যে, ওটা ছিল তখন খেজুর পাকার মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। আর খৃষ্টানরা কথিত যীশু খৃষ্টের জন্মদিন তথা তাদের ভাষায় X-mas Day বা বড় দিন উৎসব পালন করে থাকে শীতকালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে। অথচ এর কোন ভিত্তি তাদের কাছে নেই। যেমন কোন ভিত্তি নেই মুসলমানদের কাছে ১২ই রবীউল আউয়াল একই তারিখে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালনের। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী রাসূলের জন্মদিবস ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ও মৃত্যুর তারিখ ছিল ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার।

ইসলামে কারু জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালনের বিধান নেই। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় খৃষ্টান বাহিনীর বড় দিন পালনের দেখাদেখি ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩২ হি:)-এর মাধ্যমে কথিত ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথা প্রথম চালু হয়। এই বিদ‘আতী প্রথা কোন কোন মুসলিম দেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে।

(৩) এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খেজুর গাছের গোড়া ধরে নাড়া দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষ করে একজন সদ্য প্রসূত সন্তানের মায়ের পক্ষে। এর মধ্যে এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নেকীর কাজে আল্লাহর উপরে ভরসা করে বান্দাকে অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। যত সামান্যই হৌক কাজ করতে হবে। আল্লাহ তাতেই বরকত দিবেন। যেমন তালূত ও দাঊদকে আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং যেমন শেষনবী (ছাঃ)-কে আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন বিশেষভাবে হিজরতের রাত্রিতে মক্কা ত্যাগের সময়, হিজরতকালীন সফরে এবং বদর ও খন্দক যুদ্ধের কঠিন সময়ে। অতএব আমরা

ধরে নিতে পারি যে, মারিয়ামের গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব ও প্রসব পরবর্তী পবিত্রতা অর্জন সবই ছিল অলৌকিক এবং সবই অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

এর পরের ঘটনা আমরা সরাসরি কুরআন থেকে বিবৃত করব। আল্লাহ বলেন,

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا- يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوْكِ امْرَأَ سَو

ْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا- (مريم-(২৭-২৮

'অতঃপর মারিয়াম তার সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হ'ল। তারা বলল, হে মারিয়াম! তুমি একটা আশ্চর্য বস্তু নিয়ে এসেছ'। 'হে হারূণের বোন![4] তোমার পিতা কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না কিংবা তোমার মাতাও কোন ব্যভিচারিণী মহিলা ছিলেন না' (মারিয়াম ১৯/২৭-২৮)। কওমের লোকদের এ ধরনের কথা ও সন্দেহের জওয়াবে নিজে কিছু না বলে বিবি মারিয়াম তার সদ্য প্রসূত সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। অর্থাৎ একথার জবাব সেই-ই দিবে। কেননা সে আল্লাহর দেওয়া এক অলৌকিক সন্তান, যা কওমের লোকেরা জানে না। আল্লাহ বলেন,

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا- قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا- وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا- وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا- وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا- (مريم-২৯-৩৩)-

'অতঃপর মারিয়াম ঈসার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন লোকেরা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব'? (মারিয়াম ২৯)। ঈসা তখন বলে উঠল, 'আমি আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব (ইনজীল) প্রদান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন' (৩০)। 'আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে' (৩১)। 'এবং আমার মায়ের অনুগত থাকতে। আল্লাহ আমাকে উদ্ধত

ও হতভাগা করেননি’ (৩২)। ‘আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন জীবিত পুনরুত্থিত হব’ (মারিয়াম ১৯/২৯-৩৩)।

মারিয়ামের বৈশিষ্ট্য সমূহ

(১) তিনি ছিলেন বিশ্ব নারী সমাজের শীর্ষস্থানীয়া এবং আল্লাহর মনোনীত ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব (আলে ইমরান ৩/৪২)।

(২) তিনি ছিলেন সর্বদা আল্লাহর উপাসনায় রত, বিনয়ী, রুকু কারিনী ও সিজদাকারিনী (ঐ, ৩/৪৩)।

(৩) তিনি ছিলেন সতীসাধ্বী এবং আল্লাহর আদেশ ও বাণী সমূহের বাস্তবায়নকারিনী (তাহরীম ৬৬/১২)।

(৪) আল্লাহ নিজেই তার নাম রাখেন ‘মারিয়াম’ (আলে ইমরান ৩/৩৬)। অতএব তিনি ছিলেন অতীব সৌভাগ্যবতী।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(১) মারিয়াম ছিলেন তার মায়ের মানতের সন্তান এবং তার নাম আল্লাহ নিজে রেখেছিলেন।

(২) মারিয়ামের মা দো‘আ করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তানের কবল হ’তে এবং আল্লাহ সে দো‘আ কবুল করেছিলেন উত্তমরূপে। অতএব মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসার পবিত্রতা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

(৩) মারিয়াম আল্লাহর ঘর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতে রত ছিলেন এবং তাকে আল্লাহর পক্ষ হ’তে বিশেষ ফল-ফলাদির মাধ্যমে খাদ্য পরিবেশন করা হ’ত (আলে ইমরান ৩/৩৭)। এতে বুঝা যায় যে, পবিত্রাত্মা মহিলাগণ মসজিদের খিদমত করতে

পারেন এবং আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য যেকোন স্থানে খাদ্য পরিবেশন করে থাকেন।

(৪) মারিয়ামের গর্ভধারণ ও ঈসার জন্মগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক ঘটনা। আল্লাহ পাক নিয়মের স্রষ্টা এবং তিনিই নিয়মের ভঙ্গকারী। তাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করার মত কেউ নেই। তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই আদমকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পিতা ছাড়াই শুধু মাতার মাধ্যমে ঈসাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যা খুশী তাই করতে পারেন।

(৫) ঈসার জন্ম গ্রীষ্মকালে হয়েছিল খেজুর পাকার মওসুমে। খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা মতে ২৫শে ডিসেম্বরের প্রচন্ড শীতের সময়ে নয়।

(৬) ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে অথবা অদৃশ্য থেকে নেককার বান্দাকে আল্লাহর হুকুমে সাহায্য করে থাকেন। যেমন জিব্রীল মানবাকৃতি ধারণ করে মারিয়ামের জামায় ফুঁক দিলেন। অতঃপর অদৃশ্য থেকে আওয়ায দিয়ে তার খাদ্য ও পানীয়ের পথ নির্দেশ দান করলেন।

(৭) বান্দাকে কেবল প্রার্থনা করলেই চলবে না, তাকে কাজে নামতে হবে। তবেই তাতে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে। যেমন খেজুর বৃক্ষের কান্ড ধরে নাড়া দেওয়ার সামান্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমে সুপক্ক খেজুর সমূহ পতিত হয়।

(৮) বিশেষ সময়ে আল্লাহর হুকুমে শিশু সন্তানের মুখ দিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য সমূহ বের হ'তে পারে। যেমন ঈসার মুখ দিয়ে বের হয়েছিল তার মায়ের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য। বুখারী শরীফে বর্ণিত বনু ইস্রাঈলের জুরায়েজ-এর ঘটনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[5]

(৯) ঈসা কোন উপাস্য ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন অন্যদের মত আল্লাহর একজন দাস মাত্র এবং তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী ও কিতাবধারী রাসূল।

(১০) ঈসা যে বিনা বাপে পয়দা হয়েছিলেন, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, কুরআনের সর্বত্র তাঁকে 'মারিয়াম-পুত্র' (عيسى ابن مريم) বলা হয়েছে (বাক্বারাহ ২/৮৭, ২৫৩;

আলে ইমরান ৩/৪৫ প্রভৃতি)। পিতা-মাতা উভয়ে থাকলে হয়তবা তাঁকে কেবল ঈসা বলেই সম্বোধন করা হ'ত, যেমন অন্যান্য নবীগণের বেলায় করা হয়েছে। অথচ মারিয়ামকে তার পিতার দিকে সম্বন্ধ করে 'মারিয়াম বিনতে ইমরান' (ابنت عمران) 'ইমরান-কন্যা' বলা হয়েছে (তাহরীম ৬৬/১২)।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন এবং মাদানী জীবন:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাদানী জীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।-

এক. ১ম হিজরী সনের ১২ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার হ'তে ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত প্রায় ছয় বছর। এই সময় কাফের ও মুনাফিকদের মাধ্যমে ভিতরে ও বাইরের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র হামলা সমূহ সংঘটিত হয়। ইসলামকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য এ সময়ের মধ্যে সর্বমোট ৫০টি ছোট-বড় যুদ্ধ ও অভিযান সমূহ পরিচালিত হয়।

দুই. মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি চলাকালীন সময়। যার মেয়াদকাল ৬ষ্ঠ হিজরীর যুলক্বা'দাহ হ'তে ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রায় দু'বছর। এই সময়ে প্রধানতঃ ইহূদী ও তাদের মিত্রদের সাথে বড়-ছোট ২২টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তিন. ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর হ'তে ১১ হিজরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এই সময়ে দলে দলে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। চারদিক থেকে গোত্রনেতারা প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদেশী রাজন্যবর্গের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত মারফত পত্র প্রেরণ করেন। এ সময় হোবল, লাত, মানাত, 'উযযা, সুওয়া' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মূর্তিগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময়ে হোনায়েন যুদ্ধ এবং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে তাবূক যুদ্ধে গমন ও সর্বশেষ সারিইয়া উসামা প্রেরণ সহ মোট ১৮টি মিলে মাদানী জীবনের ১০ বছরে ছোট-বড় প্রায় ৯০টি যুদ্ধ ও অভিযানসমূহ পরিচালিত হয়। অবশেষে সব বাধা অতিক্রম করে ইসলাম রাষ্ট্রীয় রূপ পরিগ্রহ করে এবং তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি সমূহকে চ্যালেঞ্জ করে টিকে থাকার মত শক্তিশালী অবস্থানে উপনীত হয়। এক্ষণে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিজরত কালীন সময়ে মদীনার সামাজিক অবস্থা ও সে প্রেক্ষিতে রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ একে একে আলোচনা করব।

মদীনার সামাজিক অবস্থা (الحالة الإجتماعية فى المدينة)

খ্রিষ্টীয় ৭০ সালে প্রথমবার এবং ১৩২-৩৫ সালে দ্বিতীয়বার খ্রিষ্টান রোমকদের হামলায় বায়তুল মুক্বাদ্দাস অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহূদীরা ইয়াছরিব ও হিজায অঞ্চলে হিজরত করে (সীরাহ ছহীহাহ ১/২২৭)। মিষ্ট পানি, উর্বর অঞ্চল এবং শামের দিকে ব্যবসায়ী পথের গুরুত্বের কারণে ইহূদী বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা গোত্রদ্বয় ইয়াছরিবের পূর্ব অংশ হাররাহ (حَرَّةٌ) এলাকায় বসতি স্থাপন করে। তাদের অপর গোত্র বনু ক্বায়নুক্বা ইয়াছরিবের নিম্নভূমিতে বসতি স্থাপন করে। বনু ক্বায়নুক্বার শাখা গোত্রসমূহের আরবী নাম দেখে তাদেরকে আরব থেকে ধর্মান্তরিত ইহূদী বলে ঐতিহাসিকগণের অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। যেমন বনু ইকরিমা, বনু মু'আবিয়া, বনু 'আওফ, বনু ছা'লাবাহ প্রভৃতি নাম সমূহ। উপরোক্ত তিনটি প্রধান গোত্র ছাড়াও ছোট ছোট বিশটির অধিক ইহূদী শাখা গোত্রসমূহ ইয়াছরিবের বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

অন্যদিকে আউস ও খাযরাজ, যারা ইসমাঈল-পুত্র নাবেত (نَابِت)-এর বংশধর ছিল এবং ইয়ামনের আযদ (اْلأَزْد) গোত্রের দিকে সম্পর্কিত ছিল, তারা খ্রিষ্টীয় ২০৭ সালের দিকে ইয়ামন থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন সময়ে ইয়াছরিবে হিজরত করে। সেখানে পূর্ব থেকেই অবস্থানরত ইহূদীরা তাদেরকে ইয়াছরিবের অনুর্বর ও পরিত্যক্ত এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য করে। আউসরা বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার প্রতিবেশী হয় এবং খাযরাজরা বনু ক্বায়নুক্বার প্রতিবেশী হয়। আউসদের এলাকা খাযরাজদের এলাকার চাইতে অধিকতর উর্বর ছিল। ফলে তাদের মধ্যে নিয়মিত হানাহানি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এটাও একটা কারণ ছিল। ইহূদীরা উভয় গোত্রের উপর কর্তৃত্ব করত। তারা উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দিত। আবার উভয় দলের মধ্যে সন্ধি করে দিত। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে সংঘটিত বু'আছ যুদ্ধ। যাতে আউসরা খাযরাজদের উপর জয়লাভ করে। কিন্তু উভয় গোত্র সর্বদা পুনরায় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের আশংকা করত। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করে এবং উভয় গোত্রের ঐক্যমতে আব্দুল্লাহ বিন উবাই খাযরাজীকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর শুভাগমনে তারা উৎফুল্ল হয় এবং নিজেদের মধ্যকার সব তিক্ততা ভুলে শেষনবী (ছাঃ)-কে স্বাগত জানাবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, বু'আছ যুদ্ধের দিনটিকে আল্লাহ তাঁর রাসূলের আগমনের এবং 'ইয়াছরিব বাসীদের ইসলামে প্রবেশের অগ্রিম দিবস' (يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ صـ فِى دُخُولِهِمْ فِى الإِسْلاَمِ) হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন।[1]

উল্লেখ্য যে, আউস ও খাযরাজ ছিলেন আপন দুই ভাই এবং ইসমাঈল-পুত্র নাবেত-এর বংশধর। যারা উত্তর হেজায শাসন করতেন। কিন্তু মালেক বিন ‘আজলান খাযরাজীর গোলাম হুর বিন সুমাইরকে হত্যার কারণে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। যা প্রায় ১২০ বছর যাবৎ চলে। পরে তারা ইয়াছরিবে হিজরত করেন। সেখানে তাদের মধ্যে সর্বশেষ বু‘আছ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যার পাঁচ বছর পর রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের বরকতে উভয় দলের মধ্যে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হয় এবং তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায়। যে বিষয়ে সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত নাযিল হয় (তাফসীর ত্বাবারী হা/১৪৭৩, ৭৫৮৯; তাফসীর ইবনু কাছীর)। ২০৭ খ্রিষ্টাব্দে একই সময় বনু খোযা‘আহ গোত্র ইয়ামন থেকে হিজরত করে মক্কার নিকটবর্তী মার্রুয যাহরানে বসতি স্থাপন করে। যারা পরবর্তীকালে মক্কার শাসন ক্ষমতা লাভ করে এবং দীর্ঘদিন উক্ত ক্ষমতায় থাকে। অবশেষে তাদের জামাতা কুরায়েশ নেতা কুছাই বিন কিলাব মক্কার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। জামাতার বংশ হিসাবে বনু খোযা‘আহ সর্বদা বনু হাশেমকে সহযোগিতা করেছে। যা মক্কা বিজয় ও তার পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল।[2]

মক্কা ও মদীনার সামাজিক অবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, মক্কার সমাজ ব্যবস্থাপনায় কুরায়েশদের একক প্রভুত্ব ছিল। ধর্মীয় দিক দিয়ে তাদের অধিকাংশ মূর্তিপূজারী ছিল। যদিও সবাই আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল। হজ্জ ও ওমরাহ করত। ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের উপরে কায়েম আছে বলে তারা নিজেদেরকে ‘হানীফ’ (حَنِيْفٌ) বা ‘আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ’ বলে দাবী করত। বিগত নেককার লোকদের মূর্তির অসীলায় তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত। এই অসীলাপূজার কারণেই তারা মুশরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের রক্ত হালাল গণ্য হয়েছিল। তারাও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রচারিত নির্ভেজাল তাওহীদকে তাদের কপট ধর্ম বিশ্বাস ও দুনিয়াবী স্বার্থের বিরোধী সাব্যস্ত করে রাসূল (ছাঃ)-এর ও মুসলমানদের রক্তকে হালাল গণ্য করেছিল। মক্কায় মুসলমানরা ছিল দুর্বল ও মযলূম এবং বিরোধী কুরায়েশ নেতারা ছিল প্রবল ও পরাক্রমশালী। পক্ষান্তরে মদীনায় সমাজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কারু একক নেতৃত্ব ছিল না। ধর্মীয় দিক দিয়েও তারা এক ছিল না বা বংশধারার দিক দিয়েও এক ছিল না। সর্বশেষ বু‘আছের যুদ্ধে বিপর্যস্ত আউস ও খাযরাজ

প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। এর দ্বারা মদীনাবাসীদের আন্তরিক কামনা ছিল যে, তাঁর আগমনের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটবে। ফলে এখানে রাসূল (ছাঃ) ও মুহাজিরগণ ছিলেন শুরু থেকেই কর্তৃত্বের অধিকারী।

[1]. বুখারী হা/৩৭৭৭; সীরাহ ছহীহাহ ১/২২৭-৩১।

[2]. ইবনু হিশাম ১/৯১, ১১৭; সীরাহ ছহীহাহ ১/২২৯।

ইহূদীরা ভেবেছিল, শেষনবী হযরত ইসহাকের বংশে হবেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন। তারা ইয়াছরিবের লোকদের হুমকি দিত এই বলে যে, سَيَخْرُجُ نَبِيٌّ آخِرِ الزَّمَانِ فَنَتَّبِعُهُ وَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَم ‘আখেরী যামানার নবী সত্বর আগমন করবেন। আমরা তাঁর অনুসারী হব এবং তোমাদের হত্যা করব (বিগত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি) ‘আদ ও ইরামের ন্যায়’।[2] কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে শেষনবীর আগমন ঘটায় এবং তিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ) উভয়ের সত্যায়ন করায় ইহূদীরা তাঁর শত্রু হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে তৃতীয় দল খ্রিষ্টানরা ভেবেছিল যে, শেষনবী এসে তাদের লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী কথিত ত্রিত্ববাদ, ঈসার পুত্রত্ববাদ, প্রায়শ্চিত্ববাদ, সন্ন্যাসবাদ ও পোপের ঐশী নেতৃত্ববাদ সমর্থন করবেন। কিন্তু এসবের বিপরীত হওয়ায় তারাও রাসূল (ছাঃ)-এর বিরোধী হয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, ইহূদী ও নাছারা কারু মধ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কোনরূপ সংগ্রামী চেতনা ছিল না। ধর্মের প্রতিপাদ্য তাদের মধ্যে যা লক্ষ্য করা যেত, সেটা ছিল কেবল জাদু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, শুভাশুভ লক্ষণ নির্ধারণ ও অনুরূপ কিছু ক্রিয়া-কর্ম। এ সকল কাজের জন্যই তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী-গুণী এবং আধ্যাত্মিক গুরু ও নেতা মনে করত।

চতুর্থ আরেকটি উপদল গড়ে উঠেছিল খাযরাজ গোত্রের আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সুলূলের নেতৃত্বে। বু'আছ যুদ্ধের পর আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র মিলে তাকে নেতা নির্বাচিত করে। এজন্য তারা বহু মূল্যবান রাজমুকুট তৈরী করে এবং এই প্রথমবারের মত উভয় গোত্র একত্রিত হয়ে তাকে রাজ আসনে বসাতে যাচ্ছিল। এমনি সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে এবং উভয় গোত্র তাকে ছেড়ে রাসূল (ছাঃ)-কে নেতারূপে বরণ করে। এতে আব্দুল্লাহ ও তার অনুসারীরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় এবং তাদের সকল ক্ষোভ গিয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে। কিন্তু অবস্থা অনুকূল না দেখে তারা চুপ থাকে এবং বছর দেড়েক পরে বদর যুদ্ধের পর হতাশ হয়ে অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেয়। তবে আদি বাসিন্দা আউস ও খাযরাজদের অনেকে পূর্বেই ইসলাম কবুল করায় এবং তারাই রাসূল (ছাঃ)-কে ও মুহাজিরগণকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আশ্রয় দেওয়ায় অন্যেরা সবাই চুপ থাকে এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্ব মেনে নেয়।

মাক্কী ও মাদানী জীবনের প্রধান পার্থক্য সমূহ (الفروق الرئيسية بين الحياة المكية والمدنية)

মাক্কী ও মাদানী জীবনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, মক্কায় জন্মস্থান হ'লেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানগণ সেখানে ছিলেন দুনিয়াবী শক্তির দিক দিয়ে দুর্বল ও নির্যাতিত। পক্ষান্তরে মাদানী জীবনের প্রথম থেকেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের হাতে। এখানে বিরোধীরা স্থানীয় হ'লেও তারা ছিল নিষ্প্রভ। ফলে মদীনার অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে ইসলামকে পূর্ণতা দানের সুযোগ আসে। আর সেকারণেই ইসলামের যাবতীয় হারাম-হালাল ও আর্থ-সামাজিক বিধি-বিধান একে একে মাদানী জীবনে অবতীর্ণ হয় ও তা বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় আল্লাহর পক্ষ হ'তে পূর্ণতার সনদ হিসাবে আয়াত নাযিল হয়- اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا - 'আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপরে আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' (মায়েদাহ ৫/৩)। বিদায় হজ্জের সময় ১০ম হিজরীর ৯ই যিলহাজ্জ শুক্রবার মাগরিবের পূর্বে মক্কায় আরাফা ময়দানে অবস্থানকালে এ আয়াত নাযিল হয়।

এর মাত্র ৮৩ দিন পর ১১ হিজরীর ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার মদীনায় রাসূল (ছাঃ) মৃত্যু বরণ করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াত নাযিলের পর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তবে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন মূলক কয়েকটি মাত্র আয়াত নাযিল হয়। এভাবে আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে আল্লাহর পক্ষ হ'তে সত্য দ্বীন নাযিল হওয়ার যে সিলসিলা জারী হয়েছিল, শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে মদীনায় তার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আল্লাহ প্রেরিত ইলাহী বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

ইহূদীদের কপট চরিত্র (النفاق الطبيعى لليهود) :

হিজরতের পূর্ব থেকেই ইহূদীরা মক্কায় রাসূল (ছাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে জানত। এখন যখন তিনি মদীনায় হিজরত করে এলেন এবং মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার পথ অবলম্বন করলেন। যার ফলে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও হিংসা-হানাহানিতে বিপর্যস্ত ইয়াছরিবের গোত্র সমূহের মধ্যকার শীতল সম্পর্ক ক্রমেই উষ্ণ, মধুর ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল, তখন তা ইহূদীদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তাদের আশংকা হ'ল যে, এইভাবে যদি সবাই মুসলমান হয়ে যায় ও আপোষে ভাই ভাই হয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহ'লে তাদের 'বিভক্ত কর ও শোষণ কর' নীতি মাঠে মারা যাবে। এর ফলে তাদের সামাজিক নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। সাথে সাথে ইসলামে সূদ হারাম হওয়ার কারণে তাদের রক্তচোষা সূদী কারবার একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে, যা তাদের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ধ্বস নামাবে। এমনকি চক্রবৃদ্ধি হারে ফেঁপে ওঠা সূদের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অত্যাচারমূলক চুক্তির ফলে ইয়াছরিব বাসীদের যে বিপুল ধন-সম্পদ তারা কুক্ষিগত করেছিল, তার সবই তাদেরকে ফেরৎ দিতে বাধ্য হ'তে হবে। ফলে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে গোপনে শত্রুতা শুরু করে দেয়। পরে যা প্রকাশ্য রূপ ধারণ করে। তাদের কপট চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় পদার্পণের প্রথম দিনেই ঘটে। নিম্নের দু'টি ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।-

দু’টি দৃষ্টান্ত (نظيران للنفاق) :

(১) আবু ইয়াসির বিন আখত্বাব-এর আগমন (قدوم ياسر بن أخطب) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর প্রথম তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বনু নাযীর গোত্রের অন্যতম নেতা আবু ইয়াসির বিন আখত্বাব। তিনি তার লোকদের নিকট ফিরে গিয়ে বলেন,أَطِيْعُوْنِىْ فَإِنَّ هَذَا هُوَ النَّبِىُّ الَّذِىْ كُنَّا نَنْتَظِرُ ‘তোমরা আমার আনুগত্য কর। কেননা ইনিই সেই নবী আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম’। কিন্তু হুয়াই বিন আখত্বাব, যিনি তার ভাই ও গোত্রের নেতা ছিলেন, তার বিরোধিতার কারণে সাধারণ ইহূদীরা ইসলাম কবুল করা হ’তে বিরত থাকে।[1]

উল্লেখ্য যে, ইহূদী আলেম ও সমাজনেতাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, لَوْ آمَنَ بِىْ عَشْرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لآمَنَ بِى الْيَهُوْدُ ‘যদি আমার উপরে দশজন ইহূদী নেতা ঈমান আনত, তাহ’লে গোটা ইহূদী সম্প্রদায় আমার উপরে ঈমান আনতো’।[2] এতে বুঝা যায় যে, সমাজনেতা ও আলেমগণের দায়িত্ব সর্বাধিক। অতএব তাদের সাবধান হওয়া কর্তব্য।

(২) আব্দুল্লাহ বিন সালাম-এর ইসলাম গ্রহণে প্রতিক্রিয়া(رجعية من إسلام عبد الله بن سلام) : ক্বোবার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ইয়াছরিবে তাঁর দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করেন, তখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ’লেন ইহূদীদের সবচেয়ে বড় আলেম আব্দুল্লাহ বিন সালাম। তিনি ছিলেন বনু ক্বায়নুক্বা‘ ইহূদী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (আবুদাঊদ হা/৩০০৫)। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এমন কিছু প্রশ্ন করলেন, যার উত্তর নবী ব্যতীত কারু পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সব প্রশ্নের সঠিক জবাব পেয়ে তিনি সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে সাবধান করে দিলেন এই বলে যে, إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ إِنْ عَلِمُوْا بِإِسْلاَمِىْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُوْنِىْ عِنْدَكَ ‘ইহূদীরা হ’ল মিথ্যা অপবাদ দানকারী এক ঘৃণিত সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করার আগেই যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি জেনে ফেলে, তাহ’লে তারা আপনার নিকটে আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিবে’। তখন তিনি আব্দুল্লাহকে পাশেই আত্মগোপন করতে বলে ইহূদীদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তিনি তাদের নিকটে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা বলল, سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا،

خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا ‘আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার পুত্র। আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا ‘আমাদের মধ্যে সেরা জ্ঞানী ও সেরা জ্ঞানীর পুত্র’ (বুখারী হা/৩৯১১)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ؟ ‘আচ্ছা যদি আব্দুল্লাহ মুসলমান হয়ে যায়’? জবাবে তারা দু’বার বা তিনবার বলল, أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ ‘আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন’! অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন সালাম গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চকণ্ঠে কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। এটা শোনামাত্র ইহূদীরা বলে উঠলো, شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا ‘আমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির পুত্র’।[3] আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) তখন তাদেরকে বললেন, يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدَ اتَّقُوا اللهَ فَوَ اللهِ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ أَنَهُ رَسُوْلُ اللهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ ‘হে ইহূদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তোমরা ভালভাবেই জানো যে, ইনি আল্লাহর রাসূল এবং ইনি সত্যসহ আগমন করেছেন’। জবাবে

তারা বলল, كَذَبْتَ ‘তুমি মিথ্যা বলছ’।[4] বলা বাহুল্য এটাই ছিল ইহূদীদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা, যা তিনি মদীনায় পদার্পণের শুরুতেই অর্জন করেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ (بناء المسجد النبوى)

মদীনায় প্রবেশ করে রাসূল (ছাঃ)-এর উটনী যে স্থানে প্রথম বসে পড়েছিল, সেই স্থানটিই হ’ল পরবর্তীতে মসজিদে নববীর দরজার স্থান। স্থানটির মালিক ছিল দু’জন ইয়াতীম বালক সাহল ও সোহায়েল বিন রাফে‘ বিন ‘আমর। এটি তখন তাদের খেজুর শুকানোর চাতাল ছিল (ইবনু হিশাম ১/৪৯৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দশ দীনার মূল্যে স্থানটি খরীদ করলেন। আবুবকর (রাঃ) মূল্য পরিশোধ করলেন।[1] অতঃপর তার আশপাশের মুশরিকদের কবরগুলি উঠিয়ে ফেলা হয় এবং ভগ্নস্তূপগুলি সরিয়ে স্থানটি সমতল করা হয়। গারক্বাদের খেজুর গাছগুলি উঠিয়ে সেগুলিকে ক্বিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে পুঁতে দেওয়া হয়’ (বুখারী হা/৪২৮)। অতঃপর খেজুর গাছ ও তার পাতা দিয়ে মসজিদ তৈরী হয়। চার বছর পর এটি কাঁচা ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়।[2] ঐ সময় আল্লাহর হুকুমে ক্বিবলা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস, যা ছিল ইহূদীদের ক্বিবলা এবং মদীনা থেকে উত্তর

দিকে। মসজিদের ভিত ছিল প্রায় তিন হাত উঁচু। দরজা ছিল তিনটি। যার দু’বাহুর স্তম্ভগুলি ছিল পাথরের, মধ্যের খাম্বাগুলি খেজুর বৃক্ষের, দেওয়াল কাঁচা ইটের, ছাদ খেজুর পাতার এবং বালু ও ছোট কংকর বিছানো মেঝে- এই নিয়ে তৈরী হ’ল মসজিদে নববী, যা তখন ছিল ৭০×৬০×৫ হাত মোট ৪২০০ বর্গ হাত আয়তন বিশিষ্ট। যেখানে বর্ষায় বৃষ্টি পড়ত। ১৬ বা ১৭ মাস পরে ক্বিবলা পরিবর্তিত হ’লে উত্তর দেওয়ালের বদলে দক্ষিণ দেওয়ালের দিকে ক্বিবলা ঘুরে যায়। ফলে পিছনে একমাত্র দরজাটিই এখন ক্বিবলা হয়েছে।[3] কেননা মক্কা হ’ল মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে।

‘উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) বলেন, আনছারগণ মাল জমা করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এদিয়ে আপনি মসজিদটি আরও সুন্দরভাবে নির্মাণ করুন। কতদিন আমরা এই ছাপড়ার নীচে ছালাত আদায় করব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন,مَا بِيْ رَغْبَةٌ عن أخِي موسى، عَرِيْشٌ كَعَرِيشِ مُوسى ‘আমার ভাই মূসার ছাপড়ার ন্যায় ছাপড়া থেকে ফিরে আসতে আমার কোন আগ্রহ নেই’।[4]

[1]. আর-রাহীক্ব ১৮৪ পৃঃ; বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯০৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[2]. বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯০৬ ও ৩৫৩৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[3]. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আব্দুল গণী, তারীখুল মাসজিদিন নববী আশ-শারীফ (মদীনা : ১ম সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খৃ.) ৪১ পৃঃ।

[4]. বায়হাক্বী, দালায়েলুন নবুঅত ২/৪১৩; মুরসাল ছহীহ, ছহীহাহ হা/৬১৬।

নির্মাণ কাজে রাসূল (সাঃ) (مشاركة الرسول صـ فى بناء المسجد النبوى)

মসজিদ নির্মাণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিজ হাতে ইট ও পাথর বহন করেন। এ সময় তিনি সাথীদের উৎসাহিত করে বলতেন, اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الْآخِرَه + فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة ‘হে আল্লাহ! আখেরাতের আরাম ব্যতীত কোন আরাম নেই। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর’ (বুখারী হা/৪২৮)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إلاَّ خَيْرُ الْآخِرَهْ + فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة ‘হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের সাহায্য কর’ (বুখারী হা/৩৯৩২)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ

ْأَجْرُ الآخِرَهْ + فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَه ‘হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই পুরস্কার হ’ল আখেরাতের পুরস্কার। অতএব তুমি আনছার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ কর’ (বুখারী হা/৩৯০৬)।

মসজিদ নির্মাণের বরকতমন্ডিত কাজের প্রতি উজ্জীবিত করার জন্য তিনি বলেন, هَذَا ْالْحِمَالُ لاَ حِمَالَ خَيْبَرْ + هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَر ‘এই বোঝা খায়বরের বোঝা নয়। হে আমাদের প্রভু! একাজ অতীব পুণ্যময় ও পবিত্র’ (বুখারী হা/৩৯০৬)। রাসূল (ছাঃ)-এর নিজ হাতে কাজ করায় উৎসাহিত হয়ে ছাহাবীগণ গেয়ে ওঠেন- لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ ُيَعْمَلُ + لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّل ‘যদি আমরা বসে থাকি, আর নবী কাজ করেন, তবে সেটা আমাদের পক্ষ থেকে হবে নিতান্তই ভ্রান্ত কাজ’ (বুখারী ফৎহসহ হা/৩৯০৬)।

আযানের প্রবর্তন (بدء الأذان)

মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর মুছল্লীদের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে আহবানের জন্য পরামর্শসভা বসে। ছাহাবীগণ বিভিন্ন পরামর্শ দেন। কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক স্থগিত হয়ে যায়। পরদিন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন ‘আব্দে রবিবহী (রাঃ) প্রথমে এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বর্তমান আযানের শব্দ সমূহ সহ স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনালে তিনি তার সত্যায়ন করেন। অতঃপর উচ্চকণ্ঠের অধিকারী বেলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। আযানের ধ্বনি শুনে কাপড় ঘেঁষতে ঘেঁষতে ওমর (রাঃ) দৌড়ে এসে বললেন ‘হে আল্লাহর রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, আমিও একই স্বপ্ন দেখেছি’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফালিল্লা-হিল হামদ’ ‘আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা’।[1] একটি বর্ণনা মতে ঐ রাতে **১১** জন ছাহাবী একই আযানের স্বপ্ন দেখেন’।[2] উল্লেখ্য যে, ওমর ফারূক (রাঃ) ২০ দিন পূর্বে উক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আগেই বলেছে দেখে লজ্জায় তিনি নিজের কথা প্রকাশ করেননি।[3]

বলা বাহুল্য, এই আযান কেবল ধ্বনি মাত্র ছিল না। বরং এ ছিল শিরকের অমানিশা ভেদকারী আপোষহীন তাওহীদের এক দ্ব্যর্থহীন আহবান। যা কেবল সে যুগে মদীনার মুশরিক ও ইহূদী-নাছারাদের হৃদয়কে ভীত-কম্পিত করেনি, বরং যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত শিরকী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ ছিল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত ঘোষণা।

এ আযান যুগে যুগে প্রত্যেক আল্লাহপ্রেমীর হৃদয়ে এনে দেয় এক অনন্য প্রেমের অনবদ্য মূর্ছনা। যার আহবানে সাড়া দিয়ে মুমিন পাগলপারা হয়ে ছুটে চলে মসজিদের পানে। লুটিয়ে পড়ে সিজদায় স্বীয় প্রভুর সকাশে। তনুমন ঢেলে দিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করে আল্লাহর দরবারে। বাংলার কবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১ খৃ.) তাই কত সুন্দরই না গেয়েছেন-

কে ঐ শুনালো মোরে আযানের ধ্বনি

মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর

আকুল হইল প্রাণ নাচিল ধমনী

কে ঐ শুনালো মোরে আযানের ধ্বনি'।-

ইহূদীদের বাঁশি, নাছারাদের ঘণ্টাধ্বনি ও পৌত্তলিকদের বাদ্য-বাজনার বিপরীতে মুসলমানদের আযান ধ্বনির মধ্যেকার পার্থক্য আসমান ও যমীনের পার্থক্যের ন্যায়। আযানের মধ্যে রয়েছে ধ্বনির সাথে বাণী, রয়েছে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, রয়েছে তাওহীদের বিচ্ছুরণ এবং রয়েছে আত্মনিবেদন ও আত্মকল্যাণের এক হৃদয়ভেদী অনুরণন। এমন বহুমুখী অর্থবহ মর্মস্পর্শী ও সুউচ্চ আহবানধ্বনি পৃথিবীর কোন ধর্মে বা কোন জাতির মধ্যে নেই। ১ম হিজরী সনে আযান চালু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি তা প্রতি মুহূর্তে ধ্বনিত হচ্ছে পৃথিবীর দিকে দিকে অবিরামভাবে অপ্রতিহত গতিতে। আহ্নিক গতির কারণে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর প্রতি স্থানে সর্বদা ছালাতের সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে। সেই সাথে পরিবর্তন হচ্ছে আযানের সময়ের। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র সর্বদা প্রতিটি মিনিটে ও সেকেন্ডে আযান উচ্চারিত হচ্ছে। আর সেই সাথে ধ্বনিত হচ্ছে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যবাণী এবং উচ্চকিত হচ্ছে সর্বত্র আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্বের অনন্য ধ্বনি। যার সাক্ষী হচ্ছে প্রতিটি সজীব ও নির্জীব বস্তু ও প্রাণী। এমনকি পানির মধ্যে বিচরণকারী মৎস্যকুল। মানুষ যদি কখনো এ আহবানের মর্ম বুঝে এগিয়ে আসে, তবে পৃথিবী থেকে দূর হয়ে যাবে সকল প্রকার শিরকী জাহেলিয়াতের গাঢ় অমানিশা। টুটে যাবে মানুষের প্রতি মানুষের দাসত্ব নিগড়। প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর গোলামীর অধীনে সকল

মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। শৃংখলমুক্ত হবে সত্য, ন্যায় ও মানবতা। আযান তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিরংকুশ উলূহিয়াতের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। বিশ্বমানবতার একক চেতনা ও কল্যাণের হৃদয়স্রাবী দ্যোতনা।

[1]. আবুদাঊদ হা/৪৯৯, সনদ হাসান ছহীহ; মিশকাত হা/৬৫০।
[2]. মিরক্বাত শরহ মিশকাত 'আযান' অনুচ্ছেদ ২/১৪৯ পৃঃ।
[3]. আবুদাঊদ (আওনুল মা'বূদ সহ) হা/৪৯৪ 'আযানের সূচনা' অনুচ্ছেদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য (أخلاق الرسول صـ وخصوصياته)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন (বুখারী হা/৭)। আল্লাহপাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' (ক্বলম ৬৮/৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ 'আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য'।[1] তাই দেখা যায়, নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে' (আহযাব ৩৩/২১)। তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুর্য ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণভাবে বর্ণনা করা ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করা এবং খালি চোখে আকাশের তারকারাজি গণনা করা অসম্ভব। তবুও দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু চারিত্রিক নমুনা ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

(১) বাকরীতি (تعبير الكلام) : তিনি হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। আর একেই লোকেরা 'জাদু' বলত। তাঁর উন্নত ও শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়েই ইয়ামনের যেমাদ আযদী মুসলমান হয়ে যান।[2] নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও 'তিনি ছিলেন আরব ও অনারবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ'।[3] এমনকি 'হাদীছ জাল হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হ'ল তার শব্দসমূহের উচ্চ মানবিশিষ্ট না হওয়া' (ফাৎহুল মুগীছ)। একারণেই আরবী সাহিত্যে কুরআন ও হাদীছের প্রভাব সবার উপরে। বরং বাস্তব কথা এই যে, এই ভাষার বুকে কুরআন ও হাদীছের অবস্থানের কারণেই তা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ বাকরীতি ও আলংকরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হ'তে পেরেছে এবং ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ হিব্রু, খালেদী, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা সমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির পথে।

(২) ক্রোধ দমন শৈলী (أسلوب كظم الغيظ) : ক্রোধ দমনের এক অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি বলতেন, প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন করতে পারে।[4] আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি কখনো কাউকে নিজের স্বার্থে নিজ হাতে মারেননি। কোন মহিলা বা খাদেমকে কখনো প্রহার করেননি'।[5]

(৩) হাসি-কান্না (الضحك والبكاء) : তিনি মৃদু হাস্য করতেন। কখনোই অট্টহাস্য করতেন না। সদা প্রফুল্ল থাকতেন। কখনোই গোমড়ামুখো থাকতেন না। তবে দুশ্চিন্তায় পড়লে তার ছাপ চেহারায় পড়ত এবং তখন তিনি ছালাতে রত হ'তেন।[6] ছোটখাট হালকা রসিকতা করতেন। যেমন, (ক) একদিন স্ত্রী আয়েশার নিকটে এসে তার এক বৃদ্ধা খালা রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একথা শুনে উক্ত মহিলা কাঁদতে শুরু করল। তখন আয়েশা বললেন, তাদের কি দোষ? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআনে পড়োনি যে আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا-

عُرُبًا أَتْرَابًا- لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ‘আমরা জান্নাতী নারীদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি’। ‘অতঃপর তাদের চিরকুমারী করেছি’। সদা সোহাগিনী, সমবয়স্কা’। ‘ডান সারির লোকদের জন্য’ (ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৩৫-৩৮)।[7] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সবাই ৩০ থেকে ৩৩ বছর বয়সী হবে’।[8]

(খ) এক সফরে তিনি দেখেন যে, মহিলাদের নিয়ে তাঁর কৃষ্ণকায় উষ্ট্রচালক গোলাম আনজাশাহ দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে চলেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرِ ‘ধীরে চালাও হে আনজাশা! কাঁচের পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেল না’।[9] (গ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের সঙ্গে মিশতেন। এমনকি আমার ছোট ভাই আবু ওমায়ের একটি ‘নুগায়ের’ অর্থাৎ লাল ঠোঁট ওয়ালা চড়ুই জাতীয় পাখি পুষত। যা নিয়ে সে খেলা করত। রাসূল (ছাঃ) যখন এসে তাকে খেলতে দেখতেন, তখন বলতেন, يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْر ‘হে আবু ওমায়ের! কি করছে তোমার নুগায়ের?[10]

সালাতের মধ্যে বিশেষ করে তাহাজ্জুদের সালাতে তিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার অন্তর কেঁদে উঠতো এবং তার অভাব দূরীকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। চাচা হামযা, কন্যা যয়নব ও পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে তিনি শিশুর মত হু হু করে কেঁদেছিলেন। তিনি অন্যের মুখে কুরআন শুনতে পসন্দ করতেন। একবার ইবনু মাসঊদের মুখে সূরা নিসা শুনে তাঁর চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। অতঃপর ৪১ আয়াতে পৌঁছলে তিনি তাকে থামতে বলেন।[11]

(৪) বীরত্ব ও ধৈর্যশীলতা (الشجاعة والصبر) : কঠিন বিপদের মধ্যেও তিনি দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের আতংকময় পরিবেশে এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহবল ও অধৈর্য হ’তে দেখা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন

(আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিলেও চেহারায় তার প্রকাশ ঘটতো না। বরং সৈন্যদের সাথে আখেরাতের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই খুশীমনে নিজ হাতে খন্দক খুঁড়েছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত তাঁর ধৈর্যশীলতা ততই বেড়ে যেত। ওহোদ ও হোনায়েন যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা ছিল অচিন্তনীয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এসময় তাঁর উপর মোটা জরিদার একটি নাজরানী চাদর শোভা পাচ্ছিল। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এমন হেচকা টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকে গিয়ে পড়েন। এতে আমি দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের উপর চাদরের দাগ পড়ে গেল। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর মাল যা তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে দেবার নির্দেশ দাও (يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ)। তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন ও হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন'।[12]

উক্ত ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় ধৈর্য ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

(৫) সেবা পরায়ণতা (عيادة المرضى) : কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে সেবা করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তার জন্য দো'আ করতেন। কি খেতে মন চায় শুনতেন। ক্ষতিকর না হ'লে তা দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিজের ইহূদী কাজের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন ও পরিচর্যা করেন। এ সময় তিনি বলেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। তখন ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকাল যে তার নিকটে বসা ছিল। বাপ তাকে বলল, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ 'তুমি আবুল ক্বাসেম-এর

কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। এরপর রাসূল (ছাঃ) বের হবার সময় বললেন اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّار 'আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন'।[13]

(৬) সহজ পন্থা অবলম্বন (اتخاذ الطريقة السهلة) : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে যখনই দু'টি কাজের এখতিয়ার দেওয়া হ'ত, তখন তিনি সহজটি বেছে নিতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। তিনি নিজের জন্য কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহর জন্য হ'লে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তেন না'।[14] ওয়ায-নছীহত করতেন, যতক্ষণ না মানুষ বিব্রতবোধ করে।[15] নফল ছালাত চুপে চুপে আদায় করতেন, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়। তিনি বলতেন, فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ 'তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের সাধ্যে কুলায়'।[16]

(৭) দানশীলতা (الجود) : যতক্ষণ তাঁর কাছে কিছু থাকত, ততক্ষণ তিনি দান করতেন। রামাযান মাসে তা হয়ে যেত كَالرِّيْحِ الْمُرْسَلَة 'প্রবহমাণ বায়ুর মত'। তিনি ছাদাক্বা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু হাদিয়া নিতেন। অথচ তা নিজের প্রয়োজনে যৎসামান্য ব্যয় করে সবই দান করে দিতেন। তিনি বলতেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه 'কেউ অতক্ষণ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপরের জন্য তাই-ই ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে'।[17] তিনি বলতেন, وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا 'একজন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কখনো একত্রিত হ'তে পারে না'।[18]

(৮) লজ্জাশীলতা (الحياء) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কখনোই অন্যের উপরে নিজের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। তিনি কারু মুখের উপর কোন অপছন্দনীয় কথা বলতে লজ্জা পেতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِى

وَجْهِهِ- ‘তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে আমরা বুঝে নিতাম’।[19] কারু কোন মন্দ কাজ দেখলে সরাসরি তাকে মন্দ না বলে সাধারণভাবে নিষেধ করতেন, যাতে লোকটি লজ্জা না পায়। অথচ বিষয়টি বুঝতে পেরে সে নিজেই সংশোধন হয়ে যায়।

(৯) বিনয় ও নম্রতা (التواضع والتذلل) : তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি সবাইকে মানুষ হিসাবে সমান জ্ঞান করতেন। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করতেন না। তাঁকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়াতে ছাহাবীগণকে নিষেধ করতেন।[20] দাস-দাসীদের নিকটে কখনোই অহংকার প্রকাশ করতেন না। তাদের কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে উহ্ শব্দটি করতেন না। বরং তাদের কাজে নিজে সাহায্য করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ১০ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমাকে কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করেননি।[21] অবশ্য তার অর্থ এটা নয় যে, অন্যায় কথা বা কাজের জন্য তিনি কাউকে ধমকাতেন না বা ভৎর্সনা করতেন না। যেমন তিনি উসামা ও খালেদকে ধমকিয়েছেন এবং তাদের ব্যাপারে তিনি দায়ী নন বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছেন।[22] তিনি সর্বদা আগে সালাম দিতেন ও মুছাফাহার জন্য আগে হাত বাড়িয়ে দিতেন। ছাহাবীগণকে সম্মান করে অথবা আদর করে কখনো কখনো তাদের উপনামে ডাকতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওছমানকে তার উপনামে ‘আবুবকর’, আব্দুর রহমান বিন ছাখারকে ‘আবু হুরায়রা’ (ছোট বিড়ালের বাপ), আলীকে ‘আবু তোরাব’ (ধূলি ধুসরিত), হুযায়ফাকে ‘নাওমান’ (ঘুম কাতর), অতি সতর্ক ও সাবধানী হওয়ার কারণে আনাসকে ‘যুল উযনাইন’ (দুই কান ওয়ালা), সফরে অধিক বোঝা বহনকারী হিসাবে মুক্তদাস মিহরান বিন ফার্রূখ-কে ‘সাফীনাহ’ (নৌকা) বলে ডাকতেন।[23] উল্লেখ্য যে, খুশী অবস্থায় উপনামে ডাকা আরবীয় রীতি হিসাবে প্রসিদ্ধ।

(ক) দুগ্ধদায়িনী মা, রোগী, বৃদ্ধ, মুসাফির ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি জামা‘আতে ছালাত সংক্ষেপ করতেন।[24]

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর 'আযবা' (ُالْعَضْبَاء) নাম্নী একটা উষ্ট্রী ছিল। সে এতই দ্রুতগামী ছিল যে, কোন বাহন তাকে অতিক্রম করতে পারত না। কিন্তু একদিন এক বেদুঈনের সওয়ারী আযবা-কে অতিক্রম করে গেল। বিষয়টি মুসলমানদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হ'ল। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ 'দুনিয়াতে আল্লাহর নীতি এটাই যে, কাউকে উঁচু করলে তাকে নীচুও করে থাকেন'।[25]

(গ) জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (সৃষ্টির সেরা) বলে সম্বোধন করলে তিনি তাকে বলেন, ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 'তিনি হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)'।[26]

(ঘ) একবার এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে এসে ভয়ে বিহবল হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাকে বলেন,هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّىْ لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ 'স্থির হও! আমি কোন বাদশাহ নই। আমি একজন কুরায়েশ মহিলার সন্তান মাত্র। যিনি শুকনা মাংস ভক্ষণ করতেন'।[27] উল্লেখ্য যে, আরবের গরীব লোকেরা শুকনা মাংস খেতেন। এ সকল ঘটনায় বাস্তব জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ও নিরহংকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

(১০) সংসার জীবনে (فى حياته العائلية) : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন ও কাপড়ে তালি লাগাতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, সংসারের কাজ নিজ হাতে করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন'।[28]

স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন কুমারী ও সবচেয়ে কম বয়স্কা। তাই রাসূল (ছাঃ) কখনো কখনো সাথীদের এগিয়ে দিয়ে নিজে তার সাথে দৌড়ে পাল্লা দিতেন। তাতে

আয়েশা জিতে যেতেন। আবার আয়েশা ভারী হয়ে গেলে প্রতিযোগিতায় তিনি হেরে যান'।[29] তাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে বেদুঈন মেয়েদের নাচ-গান শুনেছেন।[30] রাসূল (ছাঃ) যে কত বাস্তববাদী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন, এতে তার প্রমাণ মেলে। খায়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নব পরিণীতা স্ত্রী ছাফিইয়াকে উটে সওয়ার করার জন্য তিনি নীচু হয়ে নিজের হাঁটু পেতে দেন। অতঃপর ছাফিইয়াহ নবীর হাঁটুর উপরে পা রেখে উটে সওয়ার হন'।[31]

(১১) সমাজ জীবনে (فى حياةه الإجتماعية) : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। নিজের ও স্ত্রী সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কারু ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ হ'তে দূরে থাকতেন। পরনিন্দা ও পরচর্চা হতে বেঁচে থাকতেন। সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি শত্রুদের দেওয়া কষ্টে ও মূর্খদের বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি মন্দকে মন্দ বলতেন ও ভালকে ভাল বলতেন। কিন্তু সর্বদা মধ্যপন্থী আচরণ করতেন।[32] তিনি সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতেন। তাঁর নিকটে লোকেদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা (আহমাদ হা/২৩৫৩৬)। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি তাঁর করুণা ছিল সর্বাধিক। তিনি বলতেন,ابْغُونِىْ فِي الضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُم 'তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তালাশ করো। কেননা তোমরা রূযিপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে'।[33] অর্থাৎ তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ কর।

[1]. হাকেম হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

2]. মুসলিম হা/৮৬৮ (৪৬); মিশকাত হা/৫৮৬০।

[3]. মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল মুলহিম শারহু মুসলিম ১৬ পৃঃ।

[4]. বুখারী হা/৬১১৪; মুসলিম হা/২৬০৯ (১০৭); মিশকাত হা/৫১০৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ২০ অনুচ্ছেদ।

[5]. মুসলিম হা/২৩২৮ (৭৯); মিশকাত হা/৫৮১৮।

[6]. আবুদাঊদ হা/১৩১৯; ছহীহুল জামে' হা/৪৭০৩; মিশকাত হা/১৩২৫।

[7]. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ওয়াক্বি'আহ ৩৫-৩৮ আয়াত; রাযীন, মিশকাত হা/৪৮৮৮, সনদ ছহীহ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'ঠাট্টা করা' অনুচ্ছেদ।

[8]. তিরমিযী হা/২৫৪৫; আহমাদ হা/২২১৫৯; ছহীহাহ হা/২৯৮৭; মিশকাত হা/৫৬৩৯।

[9]. বুখারী হা/৬২১১; মুসলিম হা/২৩২৩; মিশকাত হা/৪৮০৬।

[10]. বুখারী হা/৬১২৯; মুসলিম হা/২১৫০ (৩০); মিশকাত হা/৪৮৮৪ 'ঠাট্টা করা' অনুচ্ছেদ।

[11]. বুখারী হা/৫০৫০; মুসলিম হা/৮০০; মিশকাত হা/২১৯৫।

[12]. বুখারী হা/৬০৮৮; মুসলিম হা/১০৫৭; মিশকাত হা/৫৮০৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।

[13]. আবুদাঊদ হা/৩০৯৫; বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪ 'জানায়েয' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।

[14]. বুখারী হা/৬১২৬; মুসলিম হা/২৩২৭; মিশকাত হা/৫৮১৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।

15]. বুখারী হা/৬৪১১; মুসলিম হা/২৮২১; মিশকাত হা/২০৭।

[16]. বুখারী হা/১৯৬৬ 'ছওম' অধ্যায়-৩০ 'ছওমে বেছালে বাড়াবাড়ির শাস্তি' অনুচ্ছেদ-৪৯।

[17]. বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫ (৭২); মিশকাত হা/৪৯৬১ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ।

[18]. তিরমিযী হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮ 'জিহাদ' অধ্যায়।

[19]. বুখারী হা/৬১০২; মুসলিম হা/২৩২০; মিশকাত হা/৫৮১৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।

[20]. তিরমিযী হা/২৭৫৪; মিশকাত হা/৪৬৯৮।

[21]. বুখারী হা/৬০৩৮; মুসলিম হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৫৮০১।

[22]. মুসলিম হা/৯৬; বুখারী হা/৪৩৩৯।

[23]. আবু হুরায়রা (তিরমিযী হা/৩৮৪০); আবু তোরাব (বুখারী হা/৬২০৪); নাওমান (মুসলিম হা/১৭৮৮ (৯৯); যুল-উযনাইন (আবুদাঊদ হা/৫০০২; তিরমিযী হা/১৯৯২; মিশকাত হা/৪৮৮৭); সাফীনাহ (আহমাদ হা/২১৯৭৮, সনদ হাসান; হাদীছের প্রথমাংশ মিশকাত হা/৫৩৯৫)।

[24]. বুখারী হা/৭০৩; মুসলিম হা/৪৬৭ (১৮৩); মিশকাত হা/১১৩১, ৩৪, ২৯।

[25]. বুখারী হা/৬৫০১ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়-৮১ ‘নম্রতা’ অনুচ্ছেদ-৩৮।

[26]. মুসলিম হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৪৮৯৬ ‘শিষ্টাচারসমূহ’ অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ।

[27]. ইবনু মাজাহ হা/৩৩১২; ছহীহাহ হা/১৮৭৬।

28]. আহমাদ হা/২৬২৩৭; মিশকাত হা/৫৮২২ সনদ ছহীহ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়।

[29]. ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৯; ছহীহাহ হা/১৩১।

[30]. বুখারী হা/৫১৯০; মুসলিম হা/৮৯২ (১৮); মিশকাত হা/৩২৪৪; বুখারী হা/৫১৪৭; মিশকাত হা/৩১৪০।

[31]. বুখারী হা/৪২১১ ‘খায়বর যুদ্ধ’ অনুচ্ছেদ ।

[32]. বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬।

তথ্যসূত্র: ড: মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উনার বই থেকে কিছু পয়েন্ট নেওয়া হয়েছে।